গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৮ - ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সিপিএম-এর কেন্দ্রবিরোধী হুঙ্কারের মধ্যে সততা আছে কি

কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের বিলগ্নীকরণ, বিদেশি বিনিয়োগ, বিশেষ করে টেলিকমে ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে জনস্বার্থবিরোধী আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুংকার দিচ্ছে সিপিএম নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, তাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই কংগ্রেস একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ইউ পি এ গৃহীত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির বাইরে গিয়ে কংগ্রেস পূর্বতন বিজেপি সরকারের পথেই হাঁটছে।

প্রথমত, কংগ্রেসের জোট সরকার সিপিএমের সঙ্গে আলোচনা না করেই একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে — তাদের এই অভিযোগ কি আদৌ ঠিক? বাস্তব হল, সিপিএম নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করে কংগ্রেস একটি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করছে না। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি পড়লেই এ সত্য স্পষ্ট বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের কথায় মাঝে-মধ্যে তা প্রকাশও হয়ে পড়ছে।

ভিতরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে একত্রে বসে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, অথচ বাইরে বেরিয়ে এসে সিপিএম নেতারা প্রচার করছেন — তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করেই কংগ্রেস একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অর্থাৎ, কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি ও ক্রিয়াকলাপের সমস্ত দায় তাঁরা কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা 'ধোয়া তুলসীপাতা' সাজছেন। পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বারে বারে এই নাটক দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে কেন্দ্র দেশে তেলের দাম বাড়িয়ে চলেছে। অথচ এদেশে পেট্রল-ডিজেলের দাম সরকার যা ধার্য করছে, তার অর্ধেকই কেন্দ্রের সাথে সাথে রাজ্য সরকারগুলিরও ট্যাক্স ও সেস। জনগণের ঘাড়ে চাপানো যন্ত্রণা লাঘবের উদ্দেশ্যে কি কেন্দ্র, কি রাজ্য কোন সরকারই কর ও সেস কমাতে রাজী নয়। কেন্দ্র বলে রাজ্য তার সেস কমাক, রাজ্য বলে কেন্দ্র কর কমাক। তলে তলে দুজনেরই বোঝাপড়া।

বিশ্ববাজারে যখন তেলের দাম কমেছে, তখন এদেশে কিন্তু কেন্দ্র তেলের দাম কমাচ্ছে না। সিপিএমও কেন্দ্রকে তেলের দাম কমানোর জন্য কোন চাপও দিচ্ছে না। বরং তেলের দামবৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে তারা বাসভাড়া বাড়িয়ে দিল, জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা। চমৎকার বন্দোবস্ত! কেন্দ্র তেলের দাম বাড়িয়ে রেখে তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফা বাড়ায়, আর রাজ্য বাসভাড়া বাড়িয়ে বাসমালিকদের মুনাফা বাড়ায়।

কংগ্রেসের বিলগ্নীকরণ ও বিদেশি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে সিপিএম হুঙ্কার দিচ্ছে। অথচ যে রাজ্যে তারা ক্ষমতাসীন, সেই পশ্চিমবঙ্গে নিজেরা সেই একই জনবিরোধী নীতি আরও সুনিপুণভাবে কার্যকরী করছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু বড় বড় ব্যবসাদার ও মালিকদের সভায় হাজির হয়ে প্রচার করছেন — এ রাজ্যে বিলগ্নীকরণ ও বিদেশি বিনিয়োগের পক্ষে কত অনুকূল পরিবেশ তাঁরা তৈরি করেছেন।

দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন বুদ্ধদেববাবুরা। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় অনুষ্ঠিত কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সি আই আই)-এর পার্টনারশিপ সামিটে অংশ নিয়ে উপস্থিত শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা বড় থেকে মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পে বিদেশি লগ্নীকারীদের আহ্বান জানাচ্ছি।' (সংবাদ প্রতিদিন ১৪-১-০৫)। 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদারনীতিতে রীতিমতো বিস্মিত ইংল্যান্ডের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া হিউইট। একজন কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী যে কতটা বিনিয়োগ-বান্ধব হতে পারেন, তা তাঁর ধারণায় ছিল না বলে এদিন স্বীকার করেছেন

সাতের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- মালিকদের বিপুল ভর্তুকি
- লাভ-লোকসানের দাঁড়িপাল্লায় রোগীর জীবন
- নেপাল
- সার্বজনীন শিক্ষায় কিউবা
- রাশিয়ায় ধর্মঘট বাড়ছে
- আসামে গণআন্দোলনে এস ইউ সি আই
- রেলে ব্যাপক জনবিরোধী পদক্ষেপ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে প্রাক্ বাজেট আলোচনা সভা

জনস্বার্থবাহী বাজেটের দাবি জানাল ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রাক-বাজেট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ জানুয়ারি। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এবং এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন। তাতে দেখানো হয়েছে যে, ১৯৯১ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে যে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতি এদেশে কার্যকর করা হচ্ছে তার ফল আমরা হাতেনাতে পাচ্ছি — অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এমনকী কেরল ও পাঞ্জাবেও কয়েক হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে; লক্ষ লক্ষ শিল্পশ্রমিক তাদের কাজ হারিয়েছে; ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কয়েক লক্ষ কর্মচারীকে স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির দৈত্যাকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে আমাদের দেশের হাজার হাজার ক্ষুদ্রশিল্পের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়ে পথে বসেছে। নির্দিষ্ট মাইনে, মহার্ঘভাতা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির মত অবসরকালীন সুযোগ- সুবিধার ধ্যানধারণাকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। ঠিকা শ্রমই এখন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত। এমনকী কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারই তাদের কর্মচারীর সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে হ্রাস করছে, চাকরিতে নতুন নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, এবং যদি তারা নতুন নিয়োগ করেও, সেক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ করছে সামান্য বেতনে; অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা থাকছে না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি নিছক কথার কথা হিসাবে থাকছে, কোথাও তা দেওয়া হচ্ছে না। স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, শ্রমজীবী জনগণের এক বিশাল অংশের ক্রয়ক্ষমতা কমেই চলেছে। তার ফলে দেশের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। কিন্তু কর্পোরেট সংস্থার উন্নয়নের রঙিন প্রচার সত্ত্বেও নির্মম বাস্তবতাকে ঢাকা যাচ্ছে না। টেলিকম, জীবনবীমা, যাত্রী বিমান পরিবহণ এবং নন-ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবে দৈত্যাকার বিদেশি পুঁজির সামনে এদেশের বাজারে প্রবেশের দরজা খুলে দেবে এবং পরিণতিতে এই কর্পোরেট সংস্থাগুলির কৃপার উপর দেশবাসীর ভাগ্যকে ছেড়ে

সাতের পাতায় দেখুন

বাজেটের ১০% শিক্ষাখাতে ব্যয়ের দাবিতে ২৮ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরে এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে ছাত্রমিছিল

কর্ণাটকে বেসরকারি কলেজগুলিতে বিপুল ফি ও চার্জ-এর প্রতিবাদে বাঙ্গালোরে বিশাল ছাত্রবিক্ষোভ

নামখানা

মদ-জুয়া-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুব সম্মেলন

বেকারদের চাকরি নয়তো বেকারভাতা, মদের ঢালাও লাইসেন্স বাতিল, মদ-জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, অশ্লীল সিনেমা-ভিডিও ফিল্ম-অপসংস্কৃতি বন্ধ ইত্যাদি দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা ব্লক যুব সম্মেলন হয়ে গেল গত ৬ ফেব্রুয়ারি। উদ্যোক্তা সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র নামখানা শাখা। বহমান হাতানিয়া-দুয়ানিয়া নদীর তীরে নামখানা বাজার পার্শ্বস্থ হরিচরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান এবং অহল্যা-বাতাসীর মত শহীদদের অমর স্মৃতি বিজড়িত নামখানার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত যুব প্রতিনিধিরা যুব জীবনের নানা সমস্যা ও উল্লিখিত দাবিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে সম্মেলনের মাধ্যমে যুব কমিটি গঠন করে তাঁরা যুব আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কমরেড রণজিৎ ভূঁঞ্যাকে সভাপতি, কমরেড দুধকুমার গোলকে সহ-সভাপতি, কমরেড দিলীপ খালুয়া ও কমরেড মলয় মণ্ডলকে যুগ্মসম্পাদক, কমরেড কার্তিক সাউকে সহ-সম্পাদক এবং কমরেড শম্ভু ভূঁঞ্যাকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ২১ জনের ব্লক কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে।

বিকালে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য সভা। সভা-মঞ্চের পাশেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, আইনস্টাইন, নেতাজী ও কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনের মতোই এই সভার শুরুতেও সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমরেড সীতা পড়ুয়া। ডি ওয়াই ও'র সঙ্গীত গোষ্ঠী সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে। প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক শিক্ষক কমরেড হিমাংশু শেখর আদক। মদ-জুয়ার বিরুদ্ধে যুবক-যুবতীরা ব্লক জুড়ে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করছেন দেখে সাধারণ মানুষ অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসেন। প্রকাশ্য সভাটি কার্যত ভিড়ে ঠাসা জনসমাবেশের চেহারা নেয়। সকালের প্রতিনিধি অধিবেশনে এবং বিকালের প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও'র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল প্রামাণিক এবং কমরেড চাণক্য আচার্য। যুবকর্মী উত্তম সাহুও প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই নামখানা লোকাল কমিটির সম্পাদিকা কমরেড প্রতিভা মিশ্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুব সম্মেলন উপলক্ষে গত ২ এবং ৩ ফেব্রুয়ারি নামখানা বাজারে ৩২ দলের ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

রেলের বৃহত্তম টিবি হাসপাতালটি বন্ধ করে দেওয়া হল

খড়্গপুরে এস ই রেলওয়ে আইসোলেশন হসপিটাল, যা টি বি হাসপাতাল নামেই পরিচিত, তা গত ৩-১১-০৪ তারিখ থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ১২০ বেড বিশিষ্ট এই হাসপাতালে ২ জন বক্ষ বিশেষজ্ঞ (chest specialist), ২৫ জন নার্স সহ ৮৪ জন রেল কর্মচারী ছিলেন। কয়েক হাজার রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারের লোকজন এই হাসপাতাল থেকে নবজীবন লাভ করেছেন। এই হাসপাতালে টিবি, কলেরা, জলাতঙ্ক, বসন্ত সহ সমস্ত সংক্রামক রোগের চিকিৎসা হত। বাস্তবে টি বি রোগের প্রকোপ যখন বাড়ছে, রোগাক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহার বাড়ছে, টি বি মাল্টিড্রাগ রেজিস্টেন্স হয়ে ফিরে আসছে, তখন এইরকম আধুনিক একটি হাসপাতাল বন্ধ হওয়া নিয়ে রেলকর্মীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির ভূমিকা নিয়েও।

২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে যখন আঁচ করা গিয়েছিল যে হাসপাতালটি তুলে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে, তখনই এস ই আর এম ইউ'র কয়েকজন কর্মী প্রতিরোধের চেষ্টায় নেমে পড়েন। তাঁরা গণস্বাক্ষর, ঘেরাও, ডেপুটেশন, কর্মী মিটিং সংগঠিত করতে থাকেন। বারবার মেন'স ইউনিয়ন-এর নেতাদের কাছে দরবার করেন, যাতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। কিন্তু নেতৃত্বের আচরণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক, আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে তাঁরা অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করেন। এমনকী কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছে যে, তাঁরা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আন্দোলনের নেতৃত্বকারী কর্মীদের বদলি করিয়ে দেন, যা আন্দোলনকেই খতম করে দেয়।

অথচ সমস্ত কর্মীরাই আশা করেছিলেন যে, মেন'স কংগ্রেস কিছু না করলেও মেন'স ইউনিয়ন, যা বামপন্থী সংগঠন নামে পরিচিত — তারা অন্তত কর্মীদের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু তাদের এই আচরণ সাধারণ রেলকর্মচারী এমনকী মেন'স ইউনিয়ন-এর নিচের তলার কর্মীদেরও গভীরভাবে নিরাশ করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জেলা সম্মেলন

গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন ক্যানিং শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে ক্যানিং বাস স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন সুকুমার দত্ত। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পরিবেশবিদ চির দত্ত বলেন, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর জন্যই হু হু করে সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। এটা সমর্থন করা যায় না। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও বামফ্রন্ট সহ অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলো মিলে যে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ তৈরি করেছে, তার মূল কারণ হল বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করে ৪৮% দামবৃদ্ধি এবং বৃহৎ শিল্পকে কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বর্ধিত মাশুলের সমস্ত বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া। তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতির ফলে বৈদ্যুতিকরণের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিতে তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যখন অন্যান্য রাজ্যে কৃষিতে ৫০ পয়সা ইউনিট দাম নেওয়া হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে আগামী এপ্রিল মাসে ৪ টাকা ইউনিট দাম হতে চলেছে। সেই কারণে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে আগামী ২২ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযান সফল করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। জেলা সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তীও বক্তব্য রাখেন। পরে প্রতিনিধি সম্মেলনে সুকুমার দত্তকে সভাপতি, দিব্যেন্দু মুখার্জীকে সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মুর্শিদাবাদ

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির কনভেনশন

গত ৬ ফেব্রুয়ারি সূতী থানার ঔরঙ্গাবাদে আলিয়া সুলতানপুর মাদ্রাসা স্কুলে মুর্শিদাবাদ জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এলাকার প্রায় ৭০ জন গ্রামীণ চিকিৎসক সহ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এলাকার বিভিন্ন সরকারি হেল্‌থ সেন্টারের দুরবস্থার বিবরণ দেন। প্রধান বক্তা, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ তিমির দাস স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণে রাজ্য-কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারের ভূমিকা এবং 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ'-এর মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারি ব্যবসাদারদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডাঃ রবিউল আলম ও ডাঃ এম এ সবুর। ঐক্যবদ্ধ স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কনভেনশন থেকে সন্তোষ দাসকে সভাপতি এবং সুবোধ দাস ও আনিসুর রহমানকে যুগ্মসম্পাদক করে ৩০ জনের সূতী থানা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠিত হয়।

কোচবিহার

ক্যাপিটেশন ফি চালুর প্রতিবাদে সোচ্চার ছাত্রছাত্রীরা

রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ক্যাপিটেশন ফি চালুর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যব্যাপী দাবি দিবসে ক্যাপিটেশন ফি চালুর সার্কুলার পোড়ানো হয়। কোচবিহার জেলাতেও এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে সোচ্চার হয় ছাত্রছাত্রীরা। জেলা শহরের মূল কেন্দ্র কাছারি মোড় সহ প্রতিটি মহকুমা শহরের ও ব্লকের স্কুল গেটে, জনবহুল রাস্তার মোড়ে এই কর্মসূচী পালিত হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল পরিক্রমা করে কাছারি মোড়ে ক্যাপিটেশন ফি চালুর সার্কুলার পোড়ানো হয়। দিনহাটা, গোসানীমারী, বলরামপুর, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ ও পুণ্ডিবাড়ীতে মিছিল ও সার্কুলার পোড়ানো হয়। হলদিবাড়ী ব্লকে মিছিল করে বিডিও ডেপুটেশন ও বাজার চৌরঙ্গীতে সার্কুলার পোড়ানো হয়। তুফানগঞ্জে ডিএসও কর্মীদের উপর সিপিএমের মদতে পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ লাঠিচার্জ করে, ছাত্র কমরেড আব্দুস সালামকে তুলে নিয়ে যায়। কোচবিহার জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার মহকুমা শহর ও কামাখ্যাগুড়িতে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে সার্কুলার পোড়ান। উক্ত পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে ৯ ফেব্রুয়ারি তুফানগঞ্জ মহকুমাতে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়েছে।

রেলের বহু লেভেল ক্রসিং থেকে গেট কিপার তুলে দেওয়া হচ্ছে

রেলের নিরাপত্তা নিয়ে বছরখানেক আগে সারা দেশজুড়ে সংগঠিত হল বহু সেমিনার, কনফারেন্স প্রভৃতি। সেই সব সেমিনার, কনফারেন্সের জন্য কোটি কোটি টাকাও খরচ করা হল। নিরাপত্তার অজুহাতে প্রতিটি টিকিটে ইতিপূর্বেই এক টাকা করে সেফটি সারচার্জ বসানো হয়েছে। ফলে মনে হবে, যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা নিয়ে রেল প্রশাসন খুবই চিন্তিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য যে সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা না নিয়ে যে কোন দুর্ঘটনার পর তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কোন কর্মচারীর ওপর সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েই রেল প্রশাসন তার সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে।

দেখা গেছে, বহু রেল দুর্ঘটনার জন্য প্রহরাহীন লেভেল ক্রসিংগুলি অনেকাংশে দায়ী। তাই বারবার দাবি উঠেছে, সমস্ত লেভেল ক্রসিং-এ গেটকিপার নিয়োগ করতে হবে — যা করলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বহুগুণ কমে তো যাবেই, সাথে সাথে বহু বেকারের কর্মসংস্থান হবে। দাবির সামনে পড়ে পূর্বতন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, নীতীশ কুমার, বর্তমান রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা তা পালন তো করেনই নি, বরং উল্টো পথে হেঁটেছেন বা হাঁটছেন। কারণ যাত্রী নিরাপত্তা নয়, কর্মীসংকোচনই রেল কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য।

তাই দেখা যাচ্ছে, প্রহরাহীন লেভেল ক্রসিংগুলিতে প্রহরী নিয়োগ করার পরিবর্তে যেসব লেভেল ক্রসিংগুলিতে প্রহরী নিযুক্ত আছে, সেখান থেকেও প্রহরী তুলে নিয়ে সেগুলিকে প্রহরীহীন করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু খড়্গপুর-টাটা সেকশনেই ছ'টি লেভেল ক্রসিংকে গত ২৮-৮-২০০৪ তারিখ থেকে প্রহরীহীন করে দেওয়া হয়েছে [Sr. DEN (Co)/ KGP's letter No W/DRG/1C/De-manning Dt 24.8.04]

এর বিরুদ্ধে যদি জনসাধারণকে যুক্ত করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বহু আক্রমণ আসবে, যাতে আরও অনেক কর্মী কাজ হারাবেন। তার ফলে বহু দুর্ঘটনা ঘটবে, যাতে বহু রেলকর্মী, সাধারণ মানুষ জীবন হারাবেন। স্বীকৃত ইউনিয়নগুলির নেতারা কি একটু ভাববেন?

রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের জয়

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর নেতৃত্বে দীর্ঘ দেড় দশকের আন্দোলনের চাপে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হল জেলা প্রশাসন। এতদিন পর্যন্ত এই তালিকা প্রকাশিত না হওয়ার জন্য কর্মচারীদের পদোন্নতি আটকে ছিল। গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশের দাবিতে জেলা কালেক্টরেটের কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন সহ বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, কিন্তু কার্যকরী কোন ফল হয়নি। এরপর গত ২৬ আগস্ট, '০৪ কর্মচারীরা একদিনের ধর্মঘট পালন করেন; নূর সেলিম শেখ নামে একজন 'গ্রুপ-ডি' কর্মী সাসপেন্ড হন। অবশ্য আন্দোলনের চাপে এক মাসের মধ্যেই সরকার সাসপেনশনের আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এরপরেই গত ২৪ জানুয়ারি গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশিত হয়।

ত্রাণকার্যে অংশ নিলেন সরকারি কর্মচারীরা

'সুনামি'র আঘাতে বিপর্যস্ত মানুষদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর সদস্যরা ত্রাণসংগ্রহ অভিযানে নেমেছিলেন। সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী গত ২৫ জানুয়ারি কেরালার কোল্লাম জেলায় সুনামি বিধ্বস্ত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জনগণের জন্য নয়

মালিকদের বিপুল ভর্তুকি দিতেই সরকার ফতুর

২০০৫-০৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের আর দিন পনের বাকি। প্রতি বছরের মতো এবারেও জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি খরচকে 'ভর্তুকি' মার্কা দিয়ে, তা যতদূর সম্ভব ছাঁটাই করার কথা উঠেছে। বিশ্বায়নপন্থী অর্থনীতির পণ্ডিতদের এবং সংবাদপত্রের একাংশ এখন জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি ব্যয়ের কট্টর বিরোধী। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের অজুহাত দেখিয়ে ভর্তুকির বিরুদ্ধে এরা লাগাতার প্রচার করে যাচ্ছে। কিন্তু উন্নয়ন বলতে তারা কার উন্নয়ন বোঝাচ্ছে? দেশের কোটি কোটি অভুক্ত-অর্ধভুক্ত গরিব মানুষের? নাকি, বিপুল সম্পদের মালিক মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর? এ ব্যাপারে জনসাধারণের অভিজ্ঞতা কী বলে? এই সমস্ত প্রচারমাধ্যম নিজেদের প্রবল 'ভর্তুকি'-বিরোধী বলে জাহির করলেও খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এরা সব ধরনের ভর্তুকির বিরোধী নয়। সরকার মালিকশ্রেণীকে যে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেয় এবং তা যে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে, তা প্রচারের মধ্য দিয়ে এরা জনসাধারণের গোচরে আনেই না শুধু নয়, তা ছাঁটাই করার কথা কখনোই বলে না। অথচ অত্যাবশ্যক পণ্য বা শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারের ব্যয় ছাঁটাই করার জন্য এরা প্রবলভাবে উদগ্রীব। জনসাধারণকে মনে রাখতে হবে, মালিক-মজুরে বিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে। পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থকেই 'দেশের স্বার্থ' বলে চালিয়ে দেশের মানুষকে তারা ঠকায়। গরিব-মধ্যবিত্ত জনসাধারণ শ্রেণীসচেতন নয় বলে, তা ধরতে পারেন না। তাই দেখা যাচ্ছে, জনস্বার্থে সরকারি ব্যয়কে 'ভর্তুকি' বদনাম দিয়ে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে চালিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণাও সাধারণ মানুষের মনে এমনভাবে তারা গেঁথে দিয়েছে যে, এসব প্রশ্নে সাধারণ মানুষও কেউ কেউ বলে বসেন, 'এত টাকা সরকার কোথায় পাবে' কিংবা 'ভর্তুকি দিয়ে তো দেশ চলতে পারে না।' বুর্জোয়াশ্রেণীর চতুর প্রচারে সাধারণ মানুষ জানতেই পারেন না যে, মালিকশ্রেণীর স্বার্থে, কৃষি ও শিল্প পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি সরকার দেয়। চালাকি করে সেই খরচকে ভর্তুকি না বলে তারা এর নাম দেয় কৃষি উন্নয়ন বা শিল্পায়নের জন্য ব্যয়। অথচ জনস্বার্থে সরকারি ব্যয় হচ্ছে সংবাদপত্রের ভাষায় 'সস্তা জনমোহিনী পদক্ষেপ', যা ভোটের দিকে চেয়ে শাসকদল নেয় বা বিরোধীদল দাবি করে। বিপরীতে তারা 'বাজারের নিয়মের' জয়গান করে বলে, সকলকেই সবকিছু বাজার দরে কিনতে হবে। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, বীজ, সার ইত্যাদিকে গরিব বা মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য সরকারের অর্থব্যয় এদের মতে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী, অন্যায় ও অযৌক্তিক।

সকলকে সবকিছু বাজারদরে কিনতে হবে, এই 'বাজারের নিয়ম' মালিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে খাটে না। বাজার অর্থনীতির প্রচারকরা কখনোই বলে না যে, পুঁজিপতিদের কারখানার জন্য জল, জমি, বিদ্যুৎ বাজার দরে কিনতে হবে, পরিকাঠামো নিজের খরচে করে নিতে হবে। এরা বলে না যে, আমদানি-রপ্তানিতে কর ছাড়, যা আসলে ভর্তুকি দিয়ে পণ্যের দাম কমিয়ে মালিকদের মুনাফা সুনিশ্চিত করা ছাড়া কিছু নয়, তা বন্ধ করতে হবে। শিল্পমালিকদের সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য সরকার যে ইস্পাত, কয়লা বা অন্যান্য খনিজের দাম বেঁধে দেয়, তাও এক ধরনের ভর্তুকি। এগুলো বন্ধ করার কথা মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী তথাকথিত 'ভর্তুকি বিরোধী'রা কখনও বলে না। কৃষি ও শিল্পমালিকদের ভর্তুকি দিতে দিতেই যে সরকার ফতুর হয়ে যাচ্ছে — এই সত্য কথাটা এরা ভুলেও উচ্চারণ করে না। ভর্তুকি কমানোর প্রশ্ন উঠলেই এরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ বা রেশনে খাদ্য সরবরাহ, পেট্রল ডিজেল গ্যাস ও কেরোসিন বাবদ সরকারি ব্যয় ছাঁটাইয়ের আওয়াজ তোলে।

ভর্তুকির রকমফের ও মালিকশ্রেণীর স্বার্থ

ভর্তুকি সংক্রান্ত সরকারি নথিতে ভর্তুকির যে রকমফের দেখানো আছে, তা বিচার করলেও দেখা যাবে, ভর্তুকি দিয়ে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সরকার কত তৎপর। ১৯৯৬-৯৭ সালে সিপিএম সমর্থিত সংযুক্ত মোর্চা সরকারের অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম ধাপে ধাপে জনস্বার্থে সরকারি ব্যয় তুলে দেওয়ার লক্ষ্য থেকে ''ভারতে সরকারি ভর্তুকি'' নামে যে আলোচনাপত্র তৈরি করেন, তাতে তিন ধরনের ভর্তুকির কথা বলা হয়। প্রথম ধরন হল, সরকারি ভাষায় 'পাবলিক গুডস', বলা হয়েছে, এই খাতে ভর্তুকির দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ নয়, প্রতিটি দেশবাসীই উপকৃত হন। সরকার বলছে, এর সেরা নজির হল — প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও অসামরিক প্রশাসন। সরকারি আলোচনাপত্রে বলা হয়েছে, এগুলি বাজারদরে কেনার প্রশ্ন ওঠে না, কাজেই এক্ষেত্রে সকল ব্যয়ভার সরকারই বহন করবে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, পুলিশের কাজ বা সেনাবাহিনীর কাজ যদি ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকদের ধন-মান-সম্পত্তি রক্ষা হয়, তবে দেশের কোটি কোটি সাধারণ গরিব মধ্যবিত্ত মানুষ কি তা পাচ্ছে? বরং এ ব্যাপারে হতদরিদ্র মানুষের অবস্থা তো নিদারুণভাবে শোচনীয়। তাদের কোন নিরাপত্তাই এ সমাজে নেই। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতেই এরা অত্যন্ত তৎপর। যারা শোষণ করে, বঞ্চনা করে, সমাজে বৈষম্য টিকিয়ে রাখে, অন্যায়ের বনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠা এই পুঁজিবাদী সমাজকে যারা টিকিয়ে রাখতে চায় এবং সেজন্য জনগণের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, ন্যায্য দাবিকে দমন করতে চায় — পুলিশ, মিলিটারি, প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র তাদের হয়েই জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করে। তাই ''সকল জনগণের মঙ্গলের'' নামের আড়ালে বাস্তবে এ-হল মালিকশ্রেণীর স্বার্থে দেওয়া ১০০ শতাংশ ভর্তুকি। একে কমানো চলবে না — এই তাদের ফতোয়া।

দ্বিতীয় ধরনের ভর্তুকি হল — 'মেরিট গুডস'। এর মধ্যে পড়ে শিক্ষা (প্রাথমিক), স্বাস্থ্য, খরা-বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। সর্বশেষ হল — 'নন মেরিট লিস্ট', যাতে রয়েছে খাদ্য, সার, রেশনে কেরোসিন তেল প্রভৃতি। এই তালিকা তৈরির মধ্যেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। শিক্ষা বলতে তারা প্রাথমিক স্তরের উপরের সব স্তরেই সরকারি দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। সর্বাধিক অগ্রাধিকারের তালিকায় মিলিটারি, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে ঠাঁই দিলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বন্যা-খরা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার কম দিয়ে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় তালিকায়। চাল, গম, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি বস্তু, যা দরিদ্রতম মানুষদের, প্রান্তিক চাষীদের জরুরি দরকার, সেগুলিকে রাখা হয়েছে সর্বশেষ তালিকায়। তার ওপর লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সরকারি ব্যয়সংকোচের প্রশ্ন উঠলেই খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ওপর কোপ পড়ে সবার আগে। নামে 'মেরিট গুডস' তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, এমনকী প্রাথমিক শিক্ষাও বাস্তবে মানুষকে বাজারদরে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। একাজে কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে রাজ্য সরকারগুলি, এমনকী এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারের আগ্রহ মাঝে মাঝে কেন্দ্রকেও ছাড়িয়ে যায়। সরকারি ব্যয়ের সবদিক বিচারে নিলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ভর্তুকি তুলে দেওয়ার জন্য যারা ওকালতি করছে, তারা কেবল জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি ব্যয় ছাঁটাইয়ের কথাই বলছে। মালিকশ্রেণীকে দেওয়া বিপুল ভর্তুকি কমানোর দাবি তারা তুলছে না শুধু নয়, সমস্ত বিষয়টা তারা এমনভাবে রাখছে, যাতে মনে হবে সরকার কেবল জনগণকেই ভর্তুকি দেয় — মালিকদের নয়।

সরকারের অন্যান্য ব্যয়ের তুলনায় জনস্বার্থে ব্যয় অনেক কম

সরকার এমন কতকগুলি খাতে ব্যয় করে, যা থেকে সামান্য কিছু সুবিধা জনগণ পায়। এসব খাতে সরকারের ব্যয় কত? কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, গত বছর প্রধান প্রধান খাতে মোট 'ভর্তুকি' দিয়েছে ৪২,০২১ কোটি টাকা, যা বাজেটে ঘোষিত সামরিক ব্যয়ের (৭৮,১৭৮ কোটি টাকা) প্রায় অর্ধেক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পারমাণবিক গবেষণা বাবদ প্রচ্ছন্ন সামরিক ব্যয়কে হিসাবে নিলে জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ মোট সামরিক ব্যয়ের অর্ধেকেরও কম হয়ে যায়।

সরকারি ব্যয়ের সবচেয়ে বেশিটা যায় ঋণের সুদ মেটাতে। ২০০২-০৩ সালেই কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বৈদেশিক ঋণের সুদ মেটাতে খরচ করেছে ১,১৫,৬৬৩ কোটি টাকা; অর্থাৎ সরকারের মোট খরচের ৪৮.৩ শতাংশই গেছে ঋণের সুদ দিতে। সরকারের ঋণ ও সুদ দুটোই ক্রমাগত বাড়ছে। '৯৯-২০০০ সালে সুদ বাবদ খরচ হয়েছিল ৯০,২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, শুধু সুদ বাবদ দু'বছরে সরকারের খরচ বেড়েছে ২৫,৪১৩ কোটি টাকা। সরকার ঋণ নেয় কার স্বার্থে? জনগণের স্বার্থে নয়, জনগণকে খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা দিতে নয়। মুখ্যত পুঁজিপতিশ্রেণীর পণ্য ও কাঁচামাল, পরিবহণ এবং মালিকশ্রেণী, সেনাবাহিনী ও মন্ত্রীদের দ্রুত ও নিরাপদ যাতায়াতের জন্য রাস্তা, রেল, সেতু ও শিল্পের পরিকাঠামো নির্মাণ, পুঁজিবাদী শোষণমূলক বর্তমান রাষ্ট্র, প্রশাসন পরিচালনা ও মন্ত্রীদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য বিশাল খরচ, তার সাথে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি মিলে সরকারের আয়ের থেকে খরচ অনেক বেড়ে যায় বলেই সরকার ঋণ করে খরচ মেটায়, যার সুদের দায় বইতে সরকারি তহবিলের প্রায় অর্ধেকই চলে যায়। ঋণের সুদ বাবদ সরকার যা খরচ করে তা মোট 'ভর্তুকি'র তিন গুণেরও বেশি।

সংসদ চালাতে কত ব্যয় হয়? সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে মন্ত্রীদের যাতায়াতের জন্য নতুন বিমান কেনা হচ্ছে। এই হাতি কেনা ও পোষার বিশাল খরচ এবারের বাজেটে যোগ হবে। ২০০১ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৫৩৯ জন সদস্য নিয়ে সংসদ চালাতে দৈনিক খরচ হয় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, সাংসদ পিছু দৈনিক খরচ ২০০১ সালেই ছিল ৪২,৬৭১ টাকা, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে। পাশাপাশি ভর্তুকির জন্য দেশের নাগরিক পিছু সরকারি ব্যয় কত? গত বছর মোট ভর্তুকি ৪২,০২১ কোটি টাকার হিসাবে, দেশের ১০০ কোটি মানুষের জন্য মাথাপিছু ভর্তুকি দাঁড়ায় ৪২০ টাকা মাত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় বা সামরিক ব্যয়ের তুলনায় 'ভর্তুকি' বাবদ ব্যয় অনেক অনেক কম। সাংসদদের জন্য মাথাপিছু ব্যয়ের তুলনায় দেশের জনগণের মাথাপিছু একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অথচ, যেসব সরকারি নেতা-মন্ত্রী, অর্থনীতি বিশারদ বা সংবাদপত্র ভর্তুকির বিরুদ্ধে এত সরব, তাঁরা কিন্তু সরকারি ঋণ, ঋণের সুদ, সামরিক ব্যয় — এসব কমাবার কথা একটিবারও বলেন না। এঁরা সকলেই যেহেতু ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী অর্থনীতিটিকে পরম পবিত্র জ্ঞান করেন, মালিকশ্রেণীকেই দেশের উন্নতির সারথি মনে করেন, তাই মালিকস্বার্থে খরচগুলো এঁদের চোখে যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য, সেখানে খরচ কমানো — এদের মতে — চলবে না। কাজেই ব্যয়সঙ্কোচনের নামে জনস্বার্থ বলি দেওয়াকেই এঁরা এখন নীতি হিসাবে খাড়া করতে ব্যস্ত।

বুর্জোয়া সরকার ভর্তুকি দেয় কেন?

যে সরকার গরিব-মধ্যবিত্তের জীবনের দুঃখকষ্ট নিরসনের কোন চেষ্টাই করে না — বরং বাড়ায়, সর্বদাই মালিকদের দুঃখে কাতর, সে সরকার জনগণের সরকার নয়, সেটা মালিকদের সরকার। তেমন একটা সরকার যখন ভর্তুকি দেয়, তখন তাও সে জনস্বার্থে দেয় না, মালিকস্বার্থে দেয়। সামান্য যতটুকু জনস্বার্থে দেয়, তাও দেয় আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে। সরকারি রিপোর্টেও এই সত্যের স্বীকৃতি রয়েছে। নয়া আর্থিক নীতির আগে ভারত সরকার যে ভর্তুকি দিত তা দেওয়া কেন জরুরি তা ব্যাখ্যা করে দাগলি কমিটি (১৯৭৯) বলেছিল — ''তিনটি প্রধান কারণে ভারতীয় অর্থনীতিতে ভর্তুকি দেওয়া জরুরি। এর উদ্দেশ্য হল — প্রথমত, দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদের চূড়ান্ত বৈষম্য ও তার পরিণামকে সামলানো এবং জনগণের দুর্বলতর স্তরে কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো (raise consumption level)। দ্বিতীয়ত, অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত রেখে চাকরির সুযোগ বাড়ে এমন সব উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটানো এবং তৃতীয়ত, শিশুশিল্পকে সাময়িকভাবে ভর্তুকি দিয়ে সাহায্য করা। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই বোঝা যাবে, ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিতরকার বাজার সংকট ও আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে সামাজিক সংকটকে যতটা সম্ভব সামাল দেওয়ার জন্যই ভর্তুকি দিয়েছে পুঁজিবাদী সরকার। অর্থাৎ, সরকারি ভর্তুকি থেকে গরিব মানুষ কিছুটা সুবিধা পেলেও সেটা গৌণ, সরকারের মূল লক্ষ্য গরিবের মঙ্গল নয়, পুঁজিবাদেরই সেবা।

'৯০ সালে মনমোহন সিংয়ের অর্থমন্ত্রীত্বে নয়া আর্থিক নীতি ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই যে এসেছে, এটা আমাদের দল সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল। আমরা বলেছিলাম, স্বাধীনতার পরপরই নেহেরুর তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' 'মিশ্র অর্থনীতি' যেমন সে সময়ের ভারতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এসেছিল; তেমনই স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৩ বছরে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির শক্তিবৃদ্ধি, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে তার উত্থান, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে নিজস্বার্থে ভারতীয় একচেটিয়া গোষ্ঠীর আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় একচেটে পুঁজির যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা পূরণ করার স্বার্থেই নরসিংহ রাওয়ের সময়ে আসে নয়া আর্থিক নীতি। কাজেই নেহেরুপন্থী আর্থিক নীতি *(সিপিএমের বর্তমান বিকল্প আর্থিক নীতির সঙ্গে যার অদ্ভুত মিল)* এবং নয়া আর্থিকনীতির পার্থক্য যাই থাক, মূল লক্ষ্য দুয়েরই এক; দুয়েরই উদ্দেশ্য ভারতীয় একচেটে পুঁজির স্বার্থরক্ষা। এটা ভর্তুকি নীতির ক্ষেত্রেও সত্য।

ভর্তুকি নীতির পরিবর্তন পুঁজিবাদের স্বার্থেই

দাগলি কমিটির রিপোর্টে পুঁজিবাদের স্বার্থেই যে ভর্তুকি নীতির কথা বলা হয়েছিল, ১৯৯৬-৯৭ সালে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের ''ডিসকাসন পেপার, গভর্নমেন্ট সাবসিডিজ ইন ইন্ডিয়া''-তে তার পরিবর্তন ঘটানো হয়। এই পরিবর্তন ঘটানোর পেছনে যে হাস্যকর অজুহাত দেওয়া হয় তাহল — ভর্তুকি প্রকৃত গরিব মানুষের কাছে পৌঁছায় না।

চারের পাতায় দেখুন

আসাম

বাসভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন

পশ্চিমবাংলার সিপিএম সরকারের মতোই আসামের কংগ্রেস সরকারও অস্বাভাবিকহারে বাসভাড়া বৃদ্ধি করেছে। সেখানেও যাত্রীসাধারণের উপর সরকারি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র শক্তি এস ইউ সি আই। একদিকে ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার, অন্যদিকে ১২ জানুয়ারি পথ অবরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজধানী গুয়াহাটি।

বেসরকারি বাসমালিকদের অন্যায় দাবি মেটাতে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার সাধারণ বাসের ক্ষেত্রে ২৫%, দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রে ৪০% এবং রাতের বাসের ক্ষেত্রে ৫০% ভাড়াবৃদ্ধি করেছে। তীব্র বেকারি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, বাজারে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, বাৎসরিক ব্যাপক বন্যা ইত্যাদিতে জেরবার জনগণের ঘাড়ে ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বেসরকারি বাসমালিকদের ঘরে বিপুল মুনাফা তুলে দেবার ব্যবস্থা করাই এই ভাড়াবৃদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সর্বকালীন এই রেকর্ড ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই একক শক্তিতে প্রতিবাদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাগাতার প্রচার আন্দোলন চালানো হয়। ১২ জানুয়ারি রাজধানী গুয়াহাটির সদাব্যস্ত পল্টন বাজারে এ এস টি অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করা হয়। রাস্তার দুপাশের বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ, ফুটপাথের হকাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে এই অবরোধে সামিল হন। এর ফলে অবরোধ পেয়ে যায় এক নতুন মাত্রা। আশেপাশের এলাকা জুড়ে যানবাহন স্তব্ধ হয়ে যায়। হাজির হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী। জনতার অবরোধ ভাঙতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে আধঘণ্টা লড়াই চালিয়ে যায় জনতা। এই লড়াইতে নেতৃত্বদানকারী কমরেড বিমল নন্দী, চন্দ্রলেখা দাস ও অন্যান্য রাজ্য নেতাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে পথ অবরোধে এবং পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে এমন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরি। এক বিবৃতিতে তিনি বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার জন্য জনগণের উদ্দেশে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাস্তা ও ব্রিজ মেরামতের দাবিতে আন্দোলন

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম গোয়ালপাড়া ও জলেশ্বর — এই দুটি বিধানসভা এলাকার রাস্তাঘাট ও ব্রিজগুলি মেরামত করার দাবি দীর্ঘদিনের। প্রশাসনিক অবহেলা ও অপদার্থতার কারণে সময়মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বড়-ছোট সমস্ত রাস্তা ও ব্রিজ যানবাহন চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বছর বছর বন্যায় নদীবাঁধের ভাঙনে হাজার হাজার বিঘা জমির শস্য নষ্ট হয়, ঘরবাড়ি ধ্বংসের ফলে হাজার হাজার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়।

এস ইউ সি আই গোয়ালপাড়া জেলা কমিটির নেতৃত্বে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা রক্ষার দাবি বারে বারে জানানো হলেও সরকার ও প্রশাসন নির্বিকার। এই পরিস্থিতিতে জনগণকে সংগঠিত করে এস ইউ সি আই গোয়ালপাড়া জেলা কমিটি গত ১০ জানুয়ারি জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। বিক্ষোভ সমাবেশে ভাষণে জেলা নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন ঃ (১) সমস্ত রাস্তাঘাট ও ব্রিজ মেরামত ও মজবুত করতে হবে, যাতে যানবাহন নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে, (২) বর্ধিত বাসভাড়া অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, (৩) নদীবাঁধগুলির ভাঙন ও ভূমিক্ষয় রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, (৪) সমস্ত প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গোয়ালপাড়া জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড চন্দ্রলেখা দাস, প্রাক্তন বিধায়ক নাজমুল হক, ইনা হুসেন, আব্দুল হামিদ, ওসমান গণি মোল্লা প্রমুখ জেলা নেতৃবৃন্দ।

লাভ-লোকসানের দাঁড়িপাল্লায় গরিব রোগীর জীবন

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার পুরোটাই বেসরকারীকরণ করছে রাজ্যের সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার — চালু হচ্ছে 'থ্রি পি পলিসি' — প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ। এই মর্মে গত ২০০৪ সালের ৪ অক্টোবর, বিধানসভায় এস ইউ সি আই দলের পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পদদলিত করে সংখ্যাধিক্যের জোরে এই পরিকল্পনা পাশ করিয়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার।

এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে — ১০০০ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৬০টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০০টি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ১০,৩৫০টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ সব মিলিয়ে রাজ্যের প্রায় ১২০০০ হাসপাতাল চলে যাবে বেসরকারি পরিচালনায়। এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষা বিভাগ থেকে শুরু করে ওষুধপত্র, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, এডস্ প্রতিরোধ সহ পথ্য ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পর্যন্ত প্রায় সব বিভাগেই বিচরণ করবে — মুনাফাখোর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই 'থ্রি পি' মডেলের ভাষায় — কাকে পার্টনার করা হবে, পার্টনারশিপের ধরন কী হবে, সবটাই সরকার খোলামনে দেখবে। মোদ্দা কথা, গ্রামীণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গড়ে তোলা হবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অংশীদারী কারবার। এই সরকারি বেসরকারি পুঁজির মেলবন্ধনের খসড়া রচনা করতে গিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র বুক ফুলিয়ে বলেছেন — 'সরকার আর আর্থিক দায় বহন করতে পারবে না। রাজ্যের হাতে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো বিকাশে বিনিয়োগের মতো যথেষ্ট অর্থ নেই।' রাজ্যের মত নানা বর্ণের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখেও একই সুর — অর্থাৎ টাকা নেই। অথচ সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কী? দেশের ধনকুবের শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের দু-হাত ভরে উপঢৌকন দিতে এদের টাকার অভাব হয় না। দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের খেলাপি ঋণ মকুব এবং কর ছাড় বাবদ প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারও শিল্পোৎসাহ প্রকল্পে হাজার কোটি টাকা শিল্পপতিদের পকেটে পুরে দিয়েছে। বছর বছর বাড়ছে মিলিটারি ও পুলিশ খাতে ব্যয়। এসব কি আর্থিক অনটনের লক্ষণ? আসলে অভাব টাকার নয়, অভাব জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গির।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার এই সর্বনাশা পরিকল্পনার গায়ে জনকল্যাণের মোড়ক পরাবার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই উন্নয়নের নাম করে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ১৩ শতাংশ সুদে নেওয়া হয়েছে ৭০১ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত মেনে বড় বড় সরকারি হাসপাতালের নানা বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। হাসপাতালের ফি ও চার্জ বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বস্তুত স্বাস্থ্যক্ষেত্র এখন পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা তোলার উত্তম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফল কী হয়েছে আমাদের সবার জানা। ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, সামান্য ক্যাথিটারের অভাবে সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এবার আবার গ্রামীণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নের নামে ঢুকবে ১৫০০ কোটি টাকার জার্মান পুঁজি। এই লগ্নীপুঁজির দাপটে বাইরের দিক দিয়ে মানুষ দেখবে — হাসপাতালের চারদিকে পাঁচিল হচ্ছে, বিল্ডিং বাড়ছে, রং হচ্ছে; এ যেন গৃহকর্তার বাড়ি বিক্রির আগে চুনকাম ও মেরামতির এক বড় প্রস্তুতি। এসব দেখে মানুষের বুকে আশা জাগবে। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটবে? দেখা যাবে, প্রতিটি বিভাগে হাত বাড়িয়ে বসে আছে এক একটা বিভাগের লিজপ্রাপ্ত এক একজন ব্যবসায়ী। টাকা দাও চিকিৎসা নাও। টাকা দাও পথ্য নাও। টাকা দাও এ্যাডমিশনের টিকিট নাও। 'মুনাফা আরও মুনাফা' — পুঁজির বিকাশের এই নির্মম নিয়মে, লাভ লোকসানের দাঁড়িপাল্লায় দুলতে থাকবে জীবন মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মুমূর্ষু রোগির জীবন। দেখা যাবে, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রস্তুত রোগাক্রান্ত মানুষের জীবন ফিরিয়ে দিতে, জীবনদায়ী ওষুধ ইনজেকশন সবই আছে, কিন্তু ঐ ওষুধের অভাবে অসহায় গরিব মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রিয়জনকে এইভাবে অকালে চলে যেতে দেখে আর্ত চিৎকার করা ছাড়া অসহায় পরিজনদের আর কোন উপায় থাকবে না।

পয়সার বিনিময়ে চিকিৎসা প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — 'রুগিরা যাতে আরও মনোযোগ পান, তাই আমরা এই ব্যবস্থা নিচ্ছি।' প্রভাকরবাবুরা যে কথা বলেননি তাহল — এই 'আরও মনোযোগ' গরিব মানুষকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে, যেমন অবস্থাপন্ন মানুষ নার্সিং হোমের 'অধিক মনোযোগ' টাকা দিয়ে কিনে থাকেন। কিন্তু কাদের কাছ থেকে টাকা চাইছেন প্রভাকরবাবুদের রাজ্য সরকার? কী অবস্থা রাজ্যের গ্রামীণ সাধারণ মানুষের? রাজ্যের ৭৮ লক্ষ খেতমজুর পরিবারের গড়পড়তা মাসিক আয় পাঁচশ টাকার কম। অর্থাৎ খেতমজুরির উপর নির্ভরশীল দু'কোটির উপর গ্রামীণ মানুষ হতদরিদ্র — অনাহার এদের নিত্যসঙ্গী। সরকারি হিসাবে রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজার গ্রাম (বাস্তবে অনেক বেশি) ভয়ানক পশ্চাদপদ। আমলাশোল আজ গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে, যেখানে অভুক্ত মায়ের স্বপ্ন হল জীবনে একবার পেটভরে গরম ডাল-ভাত পেট পুরে খাওয়া। এদের কাছ থেকে 'অধিক মনোযোগের' জন্য অর্থ দাবি করছেন রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা! এর নাম জনদরদ? এর নাম বামপন্থা?

এই সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সর্বব্যাপক উদ্যোগ, তীব্র গণসংগ্রামের চাপে সরকারকে বাধ্য করতে হবে জনবিরোধী এই নীতি প্রত্যাহার করতে। এটাই পরিস্থিতির দাবি।

মালিকদের বিপুল ভরতুকি

তিনের পাতার পর

অতএব ভর্তুকি দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। প্রধান দুটি ভর্তুকি অর্থাৎ, খাদ্য ও সারে ভর্তুকি সম্পর্কে দেখানো হয় — খাদ্যে ভর্তুকির বেশিরভাগটাই বৃহৎ চাষীরা এবং সারে ভর্তুকির বেশিরভাগটাই সার কারখানার মালিকরা পায়। বলাবাহুল্য, এগুলো যুক্তি নয়, অজুহাত। ভর্তুকির প্রশ্নে যদি সরকার সত্যিই জনগণের কথা ভাবতো, তাহলে তার চেষ্টা হতো ভর্তুকির সুফল প্রকৃত গরিবদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। সেটা না করে, 'ভর্তুকির সুফল গরিবরা পাচ্ছে না বলে 'ভর্তুকি তুলে দেওয়ার যে রাস্তা সরকার নিয়েছে, তাতে এর মধ্যেও ভর্তুকির চুঁইয়ে পড়া অতি সামান্য ছিটেফোঁটাও যে সুফল সাধারণ মানুষ পেত সেটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, খাদ্যে ভর্তুকির কথা। ২০০৪-০৫ সালে খাদ্যে ভর্তুকির পরিমাণ হল ২৫,৭৪৬ কোটি টাকা। এই ভর্তুকি দেওয়ার প্রক্রিয়াটা হল কৃষিপণ্যের বৃহৎ উৎপাদক, প্রধানত পশ্চিম ভারতের বৃহৎ গমচাষীদের কাছ থেকে বেশি দরে শস্য কিনে রেশনে সস্তা দরে দেওয়া। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ভারতের বৃহৎ গমচাষীদের চাপে সরকার প্রতি বছরেই গমের ক্রয়মূল্য বাড়াচ্ছে। ভর্তুকি কমানোর প্রবক্তারা কিন্তু সংগ্রহ মূল্য কমিয়ে ব্যয় সংকোচের কথা বলছে না। তারা রেশনে বিক্রয়মূল্য বাড়ানোর কথা বলছে, সরকারও তাই করছে, যা থেকে তাদের কৃষিপুঁজিপতি-ঘেঁষা চরিত্র বেরিয়ে আসছে। বিদেশে পশুখাদ্যেরও অযোগ্য যে গম, বাজারে যার দর খুবই কম, তা চড়া দরে কিনে সরকার বৃহৎ কৃষি পুঁজিপতিদের বিক্রির বাজার ও মুনাফা নিশ্চিত করছে। খাদ্যে ভর্তুকির মূল লক্ষ্য এটাই। পশুখাদ্যেরও অযোগ্য গুণমানের এই গম দেশের গরিব মানুষকে সরকার রেশনে দিয়ে জনদরদী সাজত। নিরুপায় হয়ে দেশের অভুক্ত মানুষ সস্তায় তাইই খেতে বাধ্য হতো। এখন ভর্তুকি কমানোর জন্য সংগ্রহ মূল্য না কমিয়ে সরকার রেশনে দর বাড়াচ্ছে। ফলে পশুখাদ্যও চলে গেছে গরিবের নাগালের বাইরে। সরকারি গুদামে গম জমে যাচ্ছে, যা কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে পশুখাদ্য হিসাবে সস্তায় বেচছে। বর্তমান অবস্থায় খাদ্যে ভর্তুকি তুলে দিলে, রেশনে যেটুকু নামমাত্র কম দাম আজও আছে তাও থাকবে না। একই কথা চাল, চিনি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য। সারে ভর্তুকিরও বেশি সুবিধা পায় বৃহৎ জোতদাররা, যারা বেশি সার কেনে। কিন্তু গরিব ও প্রান্তিক চাষীকেও আধুনিক বীজে চাষ করতে ও সার দিতে হয়। ফলে ছিটে-ফোঁটা সুবিধা সে পায়। তার ওপর মরশুমে অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হয় বলে গরিব চাষীর কাছে সারে ভর্তুকির সামান্য সুবিধাটাও খুবই মূল্যবান। সারে ভর্তুকি তুলে দেওয়ায় বা কমানোয় গরিব চাষীর ওপর চাপ আরও বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, খাদ্যে বা সারে ভর্তুকির দাবি কেবল গরিব মানুষই তুলছে না, মালিকশ্রেণীও ভর্তুকির দাবি তুলছে, যদিও উভয়ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। মালিকদের স্বার্থে ভর্তুকি দিতে ও তা ক্রমাগত বাড়াতে সরকার অকৃপণ। তারা বলে না — শিল্পপতিদের সব বাজারদরে কিনতে হবে, তারা বলে না — মন্ত্রী ও সাংসদদের ভরণপোষণ, চিকিৎসা পরিবহণ নিজেদের বেতনের টাকায় খরচ চালাতে হবে। তারা বলে না — সমরসজ্জার পিছনে এতো খরচ করার মতো টাকা সরকারের নেই। কেবল জনস্বার্থে ব্যয়ের প্রশ্ন উঠলেই তারা অর্থাভাবের দোহাই দেয়। এ থেকে বেরিয়ে আসে এ সরকার মালিকদের, জনগণের নয়। তাই জনগণকে সর্বদা এই সরকারের প্রতারণা, অজুহাত, কুযুক্তিকে বুঝে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

রাশিয়ায় ধর্মঘট বেড়েছে ৮০ গুণ

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের পর এক দশকেরও কিছু বেশি সময় অতিক্রান্ত। কিন্তু নয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক ছা-ছাত্রী সাধারণ মানুষের জীবনে ভাল কিছু বয়ে আনেনি, বরং কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু। যে সব সাধারণ সুযোগসুবিধা তাঁরা সমাজতান্ত্রিক যুগে ভোগ করতেন, তার অনেক কিছুই আজ অন্তর্হিত। জীবন আজ সেখানে অনেক কঠিন, কঠোর, অভাব-দারিদ্র্য কণ্টকিত। স্বাভাবিকভাবেই তাই সাধারণ মানুষ আজ সেখানে আবার সংগ্রামের পথে, ধর্মঘট-হরতালের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে পাওয়া গেল তারই সাক্ষ্য।

রাশিয়ার ফেডারেশন স্টেট স্ট্যাটিস্টিকস্ সার্ভিস থেকে প্রকাশিত সম্প্রতি এক রিপোর্টে গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত ধর্মঘটের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ পেয়েছে, তা প্রায় চমকে দেওয়ার মতই। দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র ঐ বছর অক্টোবর মাসে হওয়া ধর্মঘটের সংখ্যাই সমগ্র ২০০৩ সালে হওয়া ধর্মঘটের মোট সংখ্যার প্রায় ৮০ গুণ বেশি। ২০০৪-এর অক্টোবরে নথিভুক্ত ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৫,৯০৭। ২০০৩ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭। আরও দেখা যাচ্ছে যে, বিরাট সংখ্যক ধর্মঘট হয়েছে নানা স্কুলে, ছাত্রছাত্রী তথা তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষক তথা বুদ্ধিজীবীরাই যার মূলশক্তি। এই ধরনের সামাজিক আলোড়ন শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৯৮ সালে বরিস ইয়েলৎসিন প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ে। এমন পরিস্থিতি হওয়ার কারণ কী?

'রমির মনিটারিং'-এর ডাইরেক্টর অফ রিসার্চ, নিকোলাই পোপভ-এর মতে, ২০০৪-এর শরৎকালের পরিস্থিতি ছিল ২০০৩ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। "প্রথমত, ২০০৩ ছিল নির্বাচনের বছর। গদির রাজনীতির ডামাডোলের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সমস্যার কথা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিল, তারা জিতলে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতিবিধান করবে। ফলে মানুষও বিভ্রান্ত হয়ে তাতে বিশ্বাস করেছিল এবং ধর্মঘট, লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের দাবি আদায় করে নেওয়ার পথ থেকে সাময়িক হলেও সরে এসেছিল।" এই সামাজিক আলোড়ন দেখে রুশ পার্লামেন্টের এক প্রতিনিধি মন্তব্য করেছেন, "বাস্তবে এ হল পাঁচ বছর দীর্ঘ সামাজিক নিদ্রার অবসান।" জাশ্চিতা (সুরক্ষা) ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সম্পাদকের মতে, এ হল ফ্রাদকভ ক্যাবিনেটের নয়া নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জবাব। কারণ, এই নীতিতে শ্রমিক সাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। (রিয়া নভস্তি, মস্কো ও নর্থস্টার কম্পাস, কানাডা)

আমেরিকায় ছাঁটাই শ্রমিকরা আন্দোলনের পথে

ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আজ মার্কিন প্রতিরক্ষা শিল্প রমরমিয়ে উঠলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবস্থা প্রায় শোচনীয়, সেখানে লে-অফ ও ছাঁটাই নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন শ্রমমন্ত্রকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১ বছরে লেঅফ-এর শিকার ৩,৩৭,০০০ শ্রমিক-কর্মচারী।

সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়ে যাওয়া আর্থিক বছরে মার্কিন দেশে মোট বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১২ বিলিয়ন ডলার। অদ্যাবধি এটা রেকর্ড ঘাটতি। এই ঘাটতির মধ্যেও নতুন নতুন সমরাস্ত্র কিনতে গিয়ে ৩০ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে।

মার্কিন দেশের ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিসটিকস জানাচ্ছে, যেখানে শিল্পসংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধি ঘটেছে ২০০ শতাংশ, সেখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি ঘটেছে আগের বছরের তুলনায় মাত্র ২.৪ শতাংশ।

মার্কিন দেশের পরিবারগুলির মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এই ঋণের বোঝার জন্য মূলত দায়ী হল মর্টগেজ, ক্রেডিট কার্ড, হাসপাতালের বিল এবং গাড়ি কেনার জন্য ঋণ। এই কারণে বেশিরভাগ শ্রমিক পরিবার মুদির দোকানে ধার, গৃহ নির্মাণ, চিকিৎসার খরচ মেটাতে অপারগ।

শ্রমমন্ত্রকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী এখন মার্কিন দেশে বেকারির হার হচ্ছে ৫.৫ শতাংশ। আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে বেকারির হার ১১ শতাংশ এবং কিশোরদের মধ্যে ১৯ শতাংশ। বেকারদের মধ্যে ২৩ শতাংশের হাতে গত তিন বছর ধরে কোন কাজ নেই। দেশে স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। যতটুকু কর্মসংস্থান হচ্ছে তা ঠিকা কাজের অস্থায়ী চাকরি। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে মার্কিন দেশে ৫০ হাজার অস্থায়ী পদের চাকরি বৃদ্ধি পেয়েছে, যেটা একটা রেকর্ড।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এসব সমস্যা নিয়ে বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি আন্দোলন করা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় এখন শ্রমিকশ্রেণী ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি, ফাইট ব্যাক প্রমুখ বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে। ১৭ অক্টোবর প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক রাজধানী ওয়াশিংটনে মিছিল করেছে। মিছিলকারীরা অবিলম্বে ইরাক যুদ্ধের অবসানও দাবি করেছে। [ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউইয়র্ক) ১৮ নভেম্বর ২০০৪]

কলকাতায় নেপালবাসীদের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

নেপালের জনগণের সংগ্রামকে আমরা নিজেদের সংগ্রাম মনে করি

"নেপালের রাজার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির দাবিতে নেপালের জনগণ যে দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন আমি প্রথমেই তার প্রতি বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা এই আন্দোলনে ইতিপূর্বে শহীদ হয়েছেন এবং এখনও প্রাণ দিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি আমার লাল সেলাম।" ১৩ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার ময়দানে আয়োজিত 'নেপালি জনঅধিকার সুরক্ষা সমিতি'র সভায় আমন্ত্রিত হয়ে একথা বলেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, নেপাল একটি ছোট্ট দেশ ; জনসংখ্যাও যেমন কম, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল। কিন্তু এইরকম একটি দেশের জনগণ গণতন্ত্রের দাবিতে যে লড়াই চালাচ্ছেন, তার তাৎপর্য বিরাট, তা মহান, ঐতিহাসিক। তাঁদের লড়াই চলছে মহান মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স-লেনিন-স্ট্যালিন ও মাও সে-তুংয়ের চিন্তায় বলীয়ান হয়ে। আপনারা জানেন, আমাদের দল এস ইউ সি আই ভারতবর্ষে শোষিত জনসাধারণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে লাগাতার গণআন্দোলন করে যাচ্ছে। আমাদের আদর্শগত হাতিয়ার হচ্ছে মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তাই নেপালের জনগণের সংগ্রামকে আমরা নিজেদের

আটের পাতায় দেখুন

উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের তৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ছাত্রবিক্ষোভ

সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্কের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সাথে সাক্ষাৎ করে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর ভিত্তিতে তারা ১০ বছর মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের সকল প্রকার তৎপরতা বন্ধ এবং ঐ প্রতিবেদনের বক্তব্য প্রকাশের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ১৩ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ করেছে। মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল শুরু হয়ে কলা ভবন, বাণিজ্য ভবন, লাইব্রেরি এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে কলা ভবনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি জনার্দন দত্ত নান্টু।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বব্যাঙ্ক একটি অর্থলগ্নীকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। নানা অপকর্মের কারণে পৃথিবীর বহু দেশে প্রতিষ্ঠানটি জনগণের প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এটির পরামর্শে ৩০ হাজার শ্রমিক বেকার করে সরকার আদমজীর মত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। সামান্য ঋণের নামে শত শত শর্ত চাপিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বব্যাঙ্কই পরামর্শ দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নামে ছাত্র বেতন-ফি বৃদ্ধির, নাইট শিফটের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের। তারা আবারও উচ্চশিক্ষা ধ্বংসের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের এ তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

(ভ্যানগার্ড, জানুয়ারি)

আমস্টারডাম ও বার্লিনে শ্রমিক বিক্ষোভ

আমস্টারডাম

হল্যান্ডবাসী প্রত্যক্ষ করল এক ঐতিহাসিক মিছিল, যাকে বলা হচ্ছে সর্বকালের বৃহত্তম মিছিল। অবসরের বয়স বৃদ্ধি ও পেনশানের পরিমাণ কমানো সহ সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেবার প্রতিবাদে এই শ্রমিক মিছিলটি হয় ২ অক্টোবর '০৪ সালে। এই মিছিলের উদ্যোক্তা ছিল হল্যান্ডের তিনটি শ্রমিক ফেডারেশন যথা FNV, CNV ও MHP। এরা ছাড়াও শতাধিক ছোটবড় শ্রমিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল এই মিছিলে অংশ নিয়েছে।

হল্যান্ডের নিউ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ম্যানিফেস্টো' জানিয়েছে, উক্ত মিছিলে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ অংশ নিয়েছে। আরও বেশি মানুষকে দেখা যেতো এই মিছিলে, পুলিশের ধূর্তামির জন্য তা হয়ে ওঠেনি। ১০ হাজার মানুষের একটি মিছিল ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে এলে পুলিশ মিছিলকারীদের অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। এরকম আরও কয়েকটি বড় মিছিলের গতিরোধ মাঝপথে করে পুলিশ।

উল্লেখ্য যে, হল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন পিটার বালকেনেনডের নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবধি সামাজিক খাতে ২৩ বিলিয়ন ডলার ছাঁটাই করেছে। আর এটা হচ্ছে হল্যান্ডের ইতিহাসে বৃহত্তম বরাদ্দ ছাঁটাই।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কিম্বা ইতালির প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকোনির মতো হল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বালকেনেনডেও হচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ইরাক দখলদারির যোগ্য সহযোগী। তাকে নিয়ে বিক্ষোভকারীরা একটি গানও বেঁধেছিল — "বালকেনেনডে এখন কোথায়? তিনি এখানে নেই, তিনি এখানে নেই। তিনি এখন আছেন খুনে বুশের সঙ্গে।"

হল্যান্ডের জনসংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৬০ লক্ষ। আর ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার। সাম্প্রতিক কাটছাঁটের আগে পর্যন্ত হল্যান্ডের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে সবচেয়ে ভাল। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপের শাসক শ্রেণীগুলি শ্রমিকের অর্জিত সামাজিক সুযোগ-সুবিধা একের পর এক কেড়ে নিতে শুরু করেছে।

২ অক্টোবরের ঐতিহাসিক মিছিলের আগে ইতিপূর্বে সামাজিক কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে দেশে একাধিক মিছিল ও শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে। বিভিন্ন মিছিলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ২০ সেপ্টেম্বর রটারডাম শহরের মিছিলটি, এতে পা মিলিয়েছিল ৬০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। আগস্ট মাসের শেষ দিকে দেশব্যাপী পরিবহণ শ্রমিকদের ধর্মঘটে বিশ্বের বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর রটারডাম বন্দরের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে।

বার্লিন

জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী দীর্ঘ সংগ্রাম করে ও অনেক রক্ত ঝরিয়ে যে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি যথা পেনশানের অধিকার, ন্যূনতম মজুরি,

ছয়ের পাতায় দেখুন

আজও কেন ইন্দোনেশিয়া দরিদ্র ও পরনির্ভর

৩০০০ আলাদা আলাদা দ্বীপ নিয়ে গঠিত তৎকালীন ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে যখন ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়, তখন দেশের সামনে ছিল এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি। ৩৫০ বছরের বৈদেশিক শাসনের শেষে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার সেদিন উদ্ভব হয়েছিল পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ হিসাবে, যার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ২১ কোটি এবং দেশের মজুত প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারও সারা পৃথিবীর প্রায় ২০ শতাংশ। এছাড়াও সেদেশে ছিল অত্যন্ত উন্নত এক মিশ্র সংস্কৃতি।

এই অবস্থা প্রায় ৫০ বছর আগেকার কথা। তারপর কী ঘটল, যার ফলে সেই অসীম সম্ভাবনাময় ইন্দোনেশিয়া থেকে গেল দরিদ্র, অন্যের উপর নির্ভরশীল। কেন সেদেশের জনগণ আজ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা এমনভাবে শোষিত? অত্যাচারী সামরিক বুটের তলায় সারা দেশ আজও নিষ্পেষিত? সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও সুনামির প্রচণ্ড আঘাতে যখন দেশের বিশাল অংশের জনগণ তীব্র দুর্দশার মধ্যে পতিত, তখন সেই দুর্যোগের মোকাবিলায় কেন এত দিশাহারা অবস্থা?

আজ ভূমিকম্প ও সুনামির দাপটে ছন্নছাড়া সেদেশের জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশায় সারা পৃথিবীর মানুষই বেদনাহত। তাঁরা চান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে কী ঘটেছিল, যার ফলে আজ ইন্দোনেশিয়ার এই শোচনীয় হাল দাঁড়াল ? কেন সেদেশের মানুষ এই চরম ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে না ত্রাণ সাহায্য বহন করে আনা বিদেশি মার্কিন সেনাদের, বা এমনকী নিজ দেশের সেনাবাহিনীকেও? কেন জনগণের চাপে পড়ে ইন্দোনেশীয় সরকারকেও তড়িঘড়ি ঘোষণা করতে হল ত্রাণের কাজে আসা বিদেশি সেনাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা? এসব কথা ঠিকমত না জানলে কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় ইন্দোনেশিয়ার মানুষের এই বিপদের দিনেও ঠিকভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, বা তাঁদের কাছে প্রয়োজন মত সাহায্য পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে এই সংক্রান্ত কোনও কিছুরই খোঁজ করা বৃথা। আজকের সুনামি বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়ার এত খবরের মধ্যেও সেখানে এমনকী একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া মুস্কিল যা মনে করায় সেই সময়কে, যখন মৃতদেহে মৃতদেহে দেশের নদীগুলির গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ১০ লক্ষকেও, যা আজকের সুনামির ধাক্কায় মৃতের সংখ্যার প্রায় দশগুণ। অথচ এখানেই কিন্তু লুকিয়ে আছে আজকে সেদেশে ত্রাণ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা, বা সেদেশের মানুষের ত্রাণ সাহায্যকারীদের প্রতি আপাতভাবে অদ্ভুত অবিশ্বাস ও অসহযোগিতার মূল কারণ। সেটা কিন্তু কোনও 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' ছিল না, বরং ছিল একটি ফ্যাসিস্ট ক্যুপ বা সামরিক অভ্যুত্থান। আর তা সফল করে তুলতে মার্কিন শাসকদের ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট।

তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। সেসময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সদ্যস্বাধীন উপনিবেশগুলিকে একজোট করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ইন্দোনেশীয় সরকারের তৎকালীন প্রধান, সেদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা সুকর্ণ। আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি পি কে আই, যার সদস্য সংখ্যা ছিল সেই সময় প্রায় ৩০ লক্ষ এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তাদের যে সব গণসংগঠন ছিল তাদের সদস্য ছিল আরও ১৭ লক্ষ মানুষ। এই বিশাল সংখ্যক সমর্থক নিয়েই সেদিন তাঁরা এসে দাঁড়াতেন প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে।

কিন্তু তখন সময়টাও ছিল অস্থির। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী মূলত প্রতিনিধিত্ব করত সেদেশের উঠতি পুঁজিপতিশ্রেণীর এবং ধনী কৃষক-জোতদার- জমিদারদের স্বার্থের — গরিব চাষীদের শোষণই ছিল যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি। আর সেই সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের মূল যোগানদার ছিল আমেরিকা। অপরদিকে তখন সোভিয়েট সংশোধনবাদের প্রভাব এসে পড়েছে পি কে আই-এর নেতৃত্বেও, যার ফল হিসাবে দেখা দিয়েছে কিছু বিভ্রান্তি।

এইরকম এক অবস্থায় ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে সেনাবাহিনী হঠাৎ এক অভ্যুত্থানে দখল করে নিল দেশের সমস্ত ক্ষমতা। সেনানায়করা যুক্তি দিল যে, কমিউনিস্টরা নাকি এক 'ক্যু'-এর চেষ্টা করছিল, যা বানচাল করতেই তাদের এই পদক্ষেপ। অথচ দেখা গেল, ক্ষমতা দখলের পর তাদের প্রথম পদক্ষেপই হল সুকর্ণ সরকারের সমস্ত নেতা ও মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা। শুধু তাই নয়, সুকর্ণ নিজেই হয়ে পড়লেন নিজ গৃহে বন্দী। অর্থাৎ, যে সরকারকে বাঁচানোর নামে এই সামরিক 'ক্যু' চালানো হল, এর ফলে সেই সরকারই হয়ে পড়ল অস্তিত্বহীন।

যদিও সেইসময় আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে এই খবর চেপে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবুও মাঝে মাঝেনানাভাবে তা প্রকাশ পেয়ে যেত। যেমন ১৯৬৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর 'টাইম ম্যাগাজিন' লিখেছিল যে, "কমিউনিস্ট, লাল সমর্থক ও তাদের পরিবারদের হাজারে হাজারে হত্যা করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত কারাগারগুলিতে দলে দলে কমিউনিস্টকে বন্দী করে জেরা করার পর হত্যা করা হচ্ছে।... এই হত্যার পরিমাণ এত বেশি যে মৃতদেহের পচনের ফলে নিকাশি ব্যবস্থায় রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বিশেষ করে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে পূর্ব জাভা ও উত্তর সুমাত্রায়, যেখানকার ভিজে বাতাস পচা মাংসের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। পর্যটকরা জানাচ্ছেন যে, ঐ অঞ্চলের ছোট ছোট নদী ও ঝরনাগুলি এখন আক্ষরিক অর্থেই মৃতদেহে মৃতদেহে বুজে এসেছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এবারের সুনামিতেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান হল উত্তর সুমাত্রাই।

যাই হোক, সেই সময় মাসের পর মাস ধরে এইভাবে মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলে। ১৯৬৬ সালের ৭ এপ্রিল ব্রিটেনের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা যায় যে, "সুরাবায়ায় একজন দূতাবাস আধিকারিক স্বীকার করেছেন যে, এই মৃতের সংখ্যা শুধুমাত্র বলিদ্বীপেই ২ লক্ষ, যেখানে মোট জনসংখ্যাই ছিল মাত্র ২০ লক্ষ। সুমাত্রাতেও এর সংখ্যা ঐ ২ লক্ষেরই কাছাকাছি এবং জাভাতেও কমপক্ষে ঐ সংখ্যক মানুষই মারা পড়েছেন।"

অবশ্য পশ্চিমী প্রচারমাধ্যমে সমগ্র বিষয়টি সে সময় গুরুত্ব পায় খুবই কম। হত্যাকাণ্ডের কোনও ছবিও তারা প্রকাশ করেনি, যাদের হত্যা করা হচ্ছে তাদের পরিচয় দিয়ে সংবাদও প্রকাশ করেনি। নিহত মানুষগুলির কি ছিল ব্যক্তিগত জীবন, কি-ই বা ছিল তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা মতামত, এসব কিছুই জানা যায়নি। পাওয়া গেল, শুধু শবদেহের সংখ্যা, আর এই বলে তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা হল যে, এসবই সেই কমিউনিস্টদের 'ক্যু'র চেষ্টার ফল।

দশ বছর পর ইন্দোনেশীয় বাহিনী ঢুকে পড়ল পূর্ব তিমর দ্বীপে এবং তা গায়ের জোরে দখল করে নিজ দেশের সঙ্গে যুক্ত করল। এর পিছনে অবশ্যই ছিল তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট হেনরি কিসিঙ্গারের বরাভয় হাত। ফলত পরবর্তী ২৫ বছর ধরে সেই ছোট্ট দেশটিতে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আগে পর্যন্ত ইন্দোনেশীয় বাহিনীর হাতে খুন হলেন আরও অন্তত ২ লক্ষ মানুষ।

আর এই অঞ্চলের ইতিহাসের সেই রক্তাক্ত সময়েই মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের কর্পোরেশনগুলি নেমে পড়ল লুঠপাটে। তাদেরই সমর্থনে যে সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল, এবার সেই বাহিনীরই প্রতিরক্ষায় শুরু করল তারা অবাধ লুণ্ঠন। তাদেরই সর্বগ্রাসী কব্জায় বাঁধা পড়ল সেদেশের মাটির তলার 'তরল সোনা' খনিজ তেল, সেদেশের বিস্তীর্ণ ক্রান্তীয় ঘন অরণ্য কাটা পড়তে লাগল তাদেরই লোভের করাতে। সেদেশের অমূল্য সব খনিজ সম্পদের মালিক হয়ে বসল তারাই, আর তাদেরই মালিকানাধীন কারখানায় নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হল সেদেশের শ্রমিক ও যুবকরা, যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমে তৈরি জামা জুতো এবং ইলেকট্রনিক্স ভোগ্যপণ্যের সম্ভার দেশ-বিদেশের বাজারে বিকোতে লাগল চড়া দামে। লাভের গুড় প্রায় পুরোটাই খেল বিদেশি কোম্পানিগুলো।

অবশ্য এই কুকীর্তির পিছনে মার্কিন মদতও বেশিদিন চাপা থাকেনি। কারণ যারা এই ব্যাপারে নানাভাবে সরাসরি যুক্ত ছিল, তারা কিছুদিনের মধ্যেই এই অভ্যুত্থানের সাফল্য নিয়ে গর্বে বুক বাজাতে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ক্যাথি ক্যাডেনের সাথে সাক্ষাতকারের সময় তাদের কয়েকজন প্রকাশ করে ফেলে সেসব কথা, যে খবর ১৯৯০ সালের মে মাসে পৃথিবীর নানান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। "প্রাক্তন সি আই এ এজেন্টরা জানাচ্ছেন যে, ইন্দোনেশিয়ায় গণহত্যার লিস্ট তৈরিতে সি আই এ'র হাত ছিল" শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, এই শতাব্দীর এক অন্যতম নৃশংস গণহত্যার ঘটনা হিসাবে এর পিছনে মার্কিন সরকার ও গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা হাজারে হাজারে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের নামের লিস্ট ইন্দোনেশীয় সেনা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়, যারা এইসব বামপন্থী নেতা কর্মীদের খুঁজে বের করে এবং নির্বিচারে হত্যা করে। প্রাক্তন মার্কিন কূটনীতিকরাই একথা জানিয়েছেন, "সেই প্রথম, আমেরিকান কর্তৃপক্ষ স্বীকার করল যে, ১৯৬৫ সালে তারা অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠভাবে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট নেতা এবং কর্মীদের এক নিখুঁত লিস্ট তৈরি করে, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা থেকে একেবারে তৃণমূল স্তরে গ্রাম পর্যায়ের কমিটির নামও।"

তাই আজ যদি সুনামি বিধ্বস্ত আচে-তে ত্রাণসামগ্রী বয়ে নিয়ে আসা মার্কিন সেনাদের প্রতি সেখানকার মানুষ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকান, বা নিজ দেশের সামরিক বাহিনীকেও বিশ্বাস না করে উঠতে পারেন, তার জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় কি? এই দেশটির জনসাধারণ যে মনে মনে ওয়াশিংটনের প্রতি ঘৃণাই পোষণ করেন, তাতে আশ্চর্যের কীই বা থাকতে পারে? শুধু বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, এই মার্কিন শাসকরাই আবার দেশে দেশে গণতন্ত্র রপ্তানির ঠিকাদারী নেয়, যাদের নিজের হাতেই লেগে আছে গণহত্যার জমাট বাঁধা কালো রক্ত। (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকা থেকে ২০-১-০৫)

আমস্টারডাম ও বার্লিনে শ্রমিক বিক্ষোভ

পাঁচের পাতার পর

নিশ্চিত চাকরির অধিকার যা তারা মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে আদায় করেছিল — সেগুলিকে ছিনিয়ে নেবার জন্য জার্মান বহুজাতিক মোটর নির্মাণকারী সংস্থা 'ফোকস ওয়াগন'-এর অন্যতম আধিকারিক ডক্টর হার্টৎস এক গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছে এবং তারই নামানুসারে এই প্রস্তাবগুলি হার্টৎস-৪ নামে কুখ্যাত। জার্মানির পার্লামেন্টে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ও আইনে পরিণত হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল থেকে বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানির সামাজিক কর্মসূচিগুলির উপর এতবড় আক্রমণ আর কখনও আসেনি।

কি আছে হার্টৎস-৪ এ? হার্টৎস-৪ এর প্রস্তাবে বেকার ভাতার হার এমন স্তরে নামিয়ে আনা হবে যার দরুণ জার্মানি বিশেষত পূর্ব জার্মানির বিশাল বেকার বাহিনী দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাবে। হার্টৎস-৪ এ নতুন কর্মসংস্থানের বিষয়টি রাখা হয়নি। তবে বেকার যুবকদের মধ্যযুগীয় দাসশ্রমিকে পরিণত করার ব্যবস্থাটি অতি যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে। ঘণ্টা পিছু এক ইউরো মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করাবে বেকারদের। এখন জার্মানিতে বেকারির হার হল ৮ শতাংশ। অন্যদিকে জার্মানির পূর্বাংশ যা একদা সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানি নামে পরিচিত ছিল সেখানে এখন বেকারির হার হচ্ছে ১৮ থেকে ২০ শতাংশ এবং সরকারি হিসেবে মোট বেকারের সংখ্যা হলো ১৫ লক্ষ ৮২ হাজার। আর এই বিশাল বেকার বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করে আছে মাত্র ৪৮ হাজারটি শূন্য পদ। হার্টৎস-৪-এর বিধান অনুযায়ী বেকার যুবকদের সর্বনিম্ন মজুরি ও বেতনে যেকোন কাজ নিতে বাধ্য করা হবে।

১ জানুয়ারি ০৫ থেকে এই আইন চালু হওয়ার আগেই জার্মানির বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলি এই আইনের সুযোগ নিতে শুরু করে দেয়। মোটর গাড়ি নির্মাতা সংস্থা 'মার্সেডিস' শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যে নতুন বেতন চুক্তি করেছে তাতে মজুরি বৃদ্ধি ছাড়াই শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে দিয়েছে। 'ফোকস ওয়াগন' কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জানিয়েছে ১৭ শতাংশ বা ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের শর্তে তারা মজুরি বাড়াবে। জেনারেল মোটরস-এর সহযোগী সংস্থা 'ওপেল' (opel) জানিয়ে দিয়েছে, চাকরি টিকিয়ে রাখতে হলে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানানো চলবে না। জার্মানির দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই আইনের বিরুদ্ধতা করছে না, তাদের বক্তব্য পার্লামেন্ট যখন আইন করেছে, তখন 'গণতন্ত্রবাদী' হিসেবে তারা আর এর বিরোধিতা করতে পারে না। নেতৃত্বের এহেন বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীরা নিজেরাই ফ্যাসিস্ট আইন হার্টৎস-৪-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সারা দেশে প্রতি সোমবার হার্টৎস-৪ এর বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং, সমাবেশ ও আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই আন্দোলন "মেন্টাগস ডেমো" অর্থাৎ "শনিবারের প্রতিবাদ" নামে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই আন্দোলনকে আরও সুসংগঠিত রূপ দেবার জন্য 'মেন্টাগস ডেমো' কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে পূর্ব জার্মানির পূর্বতন কমিউনিস্টরা। এদের ডাকে বার্লিনে ৩০ নভেম্বর ৭০ হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। [ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক) ১৪ অক্টোবর ও ৯ ডিসেম্বর ২০০৪]

কেন্দ্রবিরোধী হুঙ্কার

একের পাতার পর

তিনি।' (আনন্দবাজার ১৩-১-০৫)। রাজ্য সরকারের নিজস্ব বহু সংস্থাকেই তাঁরা বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দিয়েছেন। যেমন, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুটার (খড়্গপুর), ওয়েবেল টেলিমেটিক, ওয়েবেল ভিডিও, লাভজনক ওয়েবেল ইলেক্ট্রো সেরামিক্স, ভারত ইলেকট্রিক্যালস, রিটজ কন্টিনেন্টাল হোটেল, অতি লাভজনক মিনিদ্বীপ চিংড়ি প্রকল্প, নিরাময় ক্লিনিক, মেয়ো হাসপাতাল, কলকাতা কর্পোরেশনের তিনটি মাতৃসদন, রাজ্য পর্যটন দপ্তরের বহু ট্যুরিস্ট লজ। রাজ্য সরকারের দুটো গ্যাস টারবাইন ছিল কসবাতে; দুটি টারবাইনই বিনা পয়সায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে গোয়েঙ্কার সি ই এস সিকে। পুরুলিয়ার মধুকুণ্ডাতে অবস্থিত রাজ্য সরকারেরই সংস্থা 'দামোদর সিমেন্ট অ্যান্ড স্ল্যাগ'-এর ৯৬ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানির কাছে। সম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ১২ হাজার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাঁরা বেসরকারি হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন।

এহেন বুদ্ধদেববাবুরা যখন কেন্দ্রের বিলগ্নীকরণ ও বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতার স্লোগান তোলেন — তখন তাঁদের সততা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। বোঝা যায়, তাঁদের কেন্দ্র বিরোধিতা আসলে লোকদেখানো, লোক ঠকানোর জন্য। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হুংকার আসলে নিজেদের জনবিরোধী কার্যকলাপকে আড়াল করার কৌশল মাত্র। শুধু তাই নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সিপিএম নেতৃত্বের কেন্দ্রবিরোধী হুংকারে সর্বদাই দু'রকম কথা। প্রথমেই তাঁরা বলছেন, 'কেন্দ্রের জনবিরোধী পদক্ষেপের প্রশ্নে কোনও আপস করবেন না বামপন্থীরা' (গণশক্তি ৮-২-০৫)। শুনলে মনে হবে, জনস্বার্থ রক্ষায় তাঁরা আপসহীন লড়াই লড়বেন এবং চাপ দিয়ে প্রয়োজনে সরকার ফেলার হুমকি দিয়েও কংগ্রেসকে তাঁরা জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য করাবেন, যেহেতু তাঁদের উপর নির্ভর করে ইউ পি এ সরকার চলছে। একইসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, 'এই সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে বিজেপির সুবিধা করে দিতে পারিনা।' (গণশক্তি ৮-২-০৫)। একথার মানে কি? কেন তাঁদের এমন দ্বিমুখী কথা? প্রথমত, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সমর্থক হলেও কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির তাঁরা সমর্থক নয় বরং বিরোধী — এই ভেক্‌টা ধরে রাখার জন্য তাঁরা হুংকার ছাড়েন। আবার, এই হুংকার শুনে তাঁদের দলের সৎ কর্মী-সমর্থকরা পাছে কংগ্রেস সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের দাবি তুলে বসে, তাই 'বিজেপি জুজুর' ভয় দেখিয়ে রাখেন। সেইজন্যই বলছেন, এমন কিছু তাঁরা করবেন না, যাতে বিজেপি'র সুবিধা হয়ে যায়।

অনিল বিশ্বাস সহ সিপিএম নেতারা এখন প্রায়ই '...অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে ইউ পি এ সরকারের এন ডি এ-র পথেই হাঁটার কথা...' (গণশক্তি ৮-২-০৫) বলছেন। এবং দেশবাসীকে বোঝাতে চাইছেন যে, কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস সরকার পূর্বতন বিজেপি সরকারের নীতি নিয়েই চলছে, যেটার তাঁরা বিরোধী। এটি একটি চূড়ান্ত মিথ্যাচার। এদেশে অর্থনৈতিক উদারীকরণ, বিলগ্নীকরণ ইত্যাদি জনবিরোধী নীতিগুলি আসলে কংগ্রেসেরই আনা। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় থেকেই দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। নরসীমা রাও সরকারের (১৯৯১) নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর হাত দিয়ে নীতিগতভাবে তা কার্যকরী হতে শুরু করে। সরকারে এসে বিজেপিও একই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে কংগ্রেসের নীতিই কার্যকর করেছিল। কারণ, এই দুটো দলই চিহ্নিত পুঁজিপতিশ্রেণীর দল। জনবিক্ষোভের হাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে এই দুই দলকেই পালাবদল করে পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু এই সত্যকে গোপন করে উদারীকরণ ও বিলগ্নীকরণ নীতি মূলত বিজেপি'রই বলে সিপিএম প্রচার করছে। উদ্দেশ্য, তারা যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট সরকারে আছে সেই কংগ্রেস দল বিজেপি'র থেকে তুলনামূলক ভাল — এই কথাটা নিজেদের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের জোটবন্ধনকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা।

পাশাপাশি, আর একটি স্লোগান পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে মাঝে মাঝেই তাঁরা তোলেন — তৃতীয় বিকল্পের স্লোগান — অর্থাৎ বিজেপি নয়, কংগ্রেস নয়, বিকল্প বাম-গণতান্ত্রিক জোট। এই 'তৃতীয় বিকল্প' স্লোগানটি তাঁদের ঝুলিতে সর্বদাই থাকে। কী সেই তৃতীয় বিকল্প? জাত পাতের রাজনীতিতে চ্যাম্পিয়ান লালুপ্রসাদ ও মুলায়ম সিং যাদব, আসামের রক্তক্ষয়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের চ্যাম্পিয়ান অসম গণপরিষদ (অগপ), তামিলনাড়ুর আঞ্চলিকতাবাদী চরম দুর্নীতিগ্রস্ত জয়ললিতা বা কখনও রাজ্যে ভোটের রাজনীতিতে জয়ললিতার প্রতিদ্বন্দ্বী করুণানিধির ডি এম কে — এরাই তাঁদের তৃতীয় ফ্রন্টের সৈনিক। তাদের এই তৃতীয় বিকল্প আসলে ভোটের রাজনীতিতে বিকল্প, দর কষাকষি করে পার্লামেন্টে ও বিধানসভাগুলিতে কিছু বাড়তি সিট আদায়ের বিকল্প, চরম সুবিধাবাদী বিকল্প; জনগণের স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ের স্বার্থে কোন বিকল্প এটি নয়।

আজকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে, বামপন্থীদের সংঘবদ্ধ গণআন্দোলনই একমাত্র পারে কংগ্রেস, বিজেপি'র বুর্জোয়া বিকল্পের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বামপন্থী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে প্রকৃত জনস্বার্থে যথার্থ বিকল্প হিসাবে ভূমিকা পালন করতে। এই যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনই পারে শাসকশ্রেণীর সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে একদিকে জনগণকে নিয়ে তাদের রুটি-রুজি সহ জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে, অন্যদিকে জনগণের হাতে আদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ার তুলে দিতে। সিপিএম নেতৃত্ব কোনদিনই সেই পথে হাঁটতে চান না। আমাদের দলের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যুক্ত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বারে বারে আবেদন জানানো হয়েছে, তাঁরা সাড়া দেননি। সর্বদাই তাঁদের লক্ষ্য — কার সঙ্গে জোট গড়লে নির্বাচনে বেশি সংখ্যক সিট জেতা যায় এবং সেজন্য তাঁরা সুবিধামত যুক্তিও সৃষ্টি করেন। তাই তাঁরা ১৯৮৯ সালে প্রত্যক্ষভাবে ভি পি সিং এবং পরোক্ষভাবে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে পার্লামেন্ট নির্বাচনে লড়েছিলেন, কংগ্রেসের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়বার স্লোগান তুলে। আবার, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁরা জোট বেঁধেছেন বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়বার স্লোগান তুলে।

কংগ্রেস এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দল। পুঁজিপতিশ্রেণী দ্বিদলীয় পরিষদীয় রাজনীতি চালু করার লক্ষ্যে সর্বদিক থেকে মদত দিয়ে বিজেপিকেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খাড়া করেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি স্থানীয় আঞ্চলিক পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করছে। তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীও আবার আঞ্চলিক বাজারে নিজের নিজের শক্তি বা প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থ সহ সর্বপ্রকার সমর্থন দিচ্ছে। এই আঞ্চলিক দলগুলি যেমন একদিকে তাদের রাজ্যগুলিতে ভোটে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বৃহৎ বুর্জোয়া দল কংগ্রেস ও বিজেপি'র সঙ্গে জোট বেঁধে কেন্দ্রের ক্ষমতার অংশীদার হচ্ছে। সিপিএমও ক্ষমতার এই ভাগাভাগিতে মালিকশ্রেণীর 'গুড বুকে' নিজের স্থান করে নিয়েছে। দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণীর আরও কত বিশ্বস্ত হওয়া যায় এবং এই প্রশ্নে অন্য দলগুলিকে কত দ্রুত পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায় — সেই লড়াই-ই এখন সিপিএম নেতৃত্ব লড়ছেন। তাই দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিকে এ রাজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য তাঁরা সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন, শ্রমিক আন্দোলন তথা গণআন্দোলন যাতে মাথা তুলতে না পারে তার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অন্য দলগুলির তুলনায় মালিকদের আরও কত বেশি সুযোগসুবিধা দিয়ে তাদের আরও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারেন — তার চেষ্টা করছেন। এই যাঁদের চরিত্র — তাঁরা কি জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারেন? কখনই না। তাঁরা তাঁদের এই মালিক-তোষণ চরিত্রকে নানা বুকনির আড়ালে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন এবং নিজেদেরকে গরিব মেহনতি জনতার বন্ধু হিসেবে প্রচার করছেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তাঁদের এই মিথ্যা আবরণ খসে পড়ছে, জন-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তাদের প্রকৃত স্বরূপ। হাজার মনোমুগ্ধকর স্লোগানেও তা ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না।

কমরেড নগেন্দ্র শর্মা স্মরণসভা

গত ৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নগেন্দ্র শর্মার স্মরণসভা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরালা সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতে পার্টির উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক ও স্মরণসভার সভাপতি কমরেড ভি এন সিং, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সম্পাদক ও স্মরণসভার প্রধান বক্তা কমরেড অচিন্ত্য সিংহ, অডিটার্স জেনারেল (এ জি) অফিস কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং এস ইউ সি আই উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রয়াত কমরেড এন কে শর্মার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। ডি এস ও পরিচালিত সঙ্গীতগোষ্ঠী সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে।

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রেরিত শোকবার্তা সভায় পাঠ করা হয়। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুধাংশু কুমার মালব্য বলেন — কমরেড এন কে শর্মার বিপ্লবী তেজ ছিল অদম্য ; হতাশা নিরাশা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। প্রয়াত কমরেডের পত্নী কমরেড লতা শর্মা বলেন, কমরেড শর্মা এলাহাবাদে যে মশাল জ্বালিয়েছেন তাকে আমাদের সদা প্রোজ্জ্বল রাখতে হবে। এরপর, গত ৫ই আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভায় প্রদত্ত প্রয়াত কমরেড এন কে শর্মার লিখিত ভাষণটি পাঠ করে শোনান হয়। তাতে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ''গোটা দেশে বর্তমানে এস ইউ সি আই-এর মতো বৃহৎ ও সুসংগঠিত অন্য কোনও দল অন্তত আমার চোখে পড়েনি।'' সভার প্রধান বক্তা কমরেড অচিন্ত্য সিংহ বলেন, ''কমরেড শর্মার সঠিক মূল্যায়ন করতে আমার চেয়েও উচ্চস্তরের নেতার প্রয়োজন।'' তিনি বলেন, ''কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, কেবল আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্ঠার দ্বারাই বিপ্লবী চেতনা গড়ে উঠতে পারে না ; ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেণীসংগ্রামে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই বিপ্লবী চেতনা গড়ে উঠতে পারে। কমরেড ঘোষ আরও শিখিয়েছেন, নিজের ত্রুটি দূর করার উপায় হল অপরের গুণাবলী এবং নিজের ভুলগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কমরেড শর্মা তাঁর জীবনে এই শিক্ষাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণের সংগ্রাম করে গিয়েছেন।''

সি পি আই নেতা প্রাণকৃষ্ণ মুরারী, কমরেড এন কে শর্মার জীবনসংগ্রামের উপর আলোকপাত করে বলেন, ''ওঁর মধ্যে তিনটি গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একাধারে দক্ষ সংগঠক, ক্ষমতাশালী প্রচারক ও আন্দোলনের নেতা।'' এ জি অফিস ব্রাদারহুডের নেতা আর কে শর্মা বলেন, ''তিনি সর্বদাই দলের কর্মীদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন।'' এ জি অফিস কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা মহম্মদ মুইম বলেন, ''কমরেড শর্মা সর্বদা সংগ্রামের মধ্যেই থাকতেন, কোনদিন আপস করেননি।''

সভাপতি কমরেড ভি এন সিং বলেন, ''গভীর নিষ্ঠা ছাড়া যথার্থ চরিত্র গড়ে ওঠেনা। ভালবাসা, ত্যাগ প্রভৃতি মনোবৃত্তিরও শ্রেণীচরিত্র আছে। কমরেড এন কে শর্মার জীবনাবসানের আঘাতকে শোষণমুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্পে পরিণত করতে হবে।''

জৌনপুর, প্রতাপগড়, সুলতানপুর, বালিয়া, গাজিপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ প্রভৃতি জেলা থেকে দলের কমরেডরা স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। এস ইউ সি আই সঙ্গীতগোষ্ঠীর দ্বারা আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

জনস্বার্থবাহী বাজেটের দাবি

একের পাতার পর

দেওয়া হবে। এর বিনিময়ে এদেশের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকগোষ্ঠী বিশ্ববাজারের অংশীদার অন্যান্য দেশগুলিতে শোষণ-লুণ্ঠনের ছাড়পত্র পাবে। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে বিপুল পরিমাণ কর ছাড় দেওয়ার ফলে বাড়ছে রাজস্ব ঘাটতি এবং তা থেকে আসছে আর্থিক সঙ্কট। আর সেই সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে; তাদের বইতে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি এবং পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বারংবার মূল্যবৃদ্ধির বোঝা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, পূর্বতন বিজেপি জোট সরকারের মতই বর্তমান কংগ্রেসের জোট সরকারও পুনরায় তথাকথিত ভর্তুকির 'বাজে খরচ' কমানোর নামে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারি পরিবহণের মত অত্যাবশ্যক পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে ব্যয়হ্রাসের পরিকল্পনা করছে। সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, আর্থিক ঘাটতি কমাতে সরকার মারুতি, ভেল-এর মত অত্যন্ত লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে সরকারি শেয়ার বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এমনকী, সরকার ১০০ দিনের কাজের নিরাপত্তা আইনের মতো ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতির কথা অভিন্ন কর্মসূচিতে বলেছিল, সেটারও যে চেহারা বাস্তবে দাঁড়াচ্ছে তাকে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। মুমূর্ষু বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার জীবনকালকে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম ১৯৪৮ সালে যে গ্যাট রচনা করেছিল সেটাই এখন বিশ্বায়নের নীতি; প্রকৃতিগতভাবেই তা চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী এবং সেকারণে একে মানবিক রূপ দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

বর্তমান সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে হলে এবং বাজেটকে কর্পোরেট-বান্ধব না করে প্রকৃত জনস্বার্থবাহী করে তুলতে হলে অবশ্যই চাকরি ও সামাজিক নিরাপত্তা ভিত্তিক বাজেট রচনা করা উচিত। সেই প্রশ্নে, প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ১৯ দফা দাবি সংযোজিত করা হয়েছে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কমরেড স্বপন মল্লিকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য, দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড স্বপন মল্লিক আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমরেড স্বপন মল্লিক ১৯৬৯ সালে এস ইউ সি আই-এর সংস্পর্শে আসেন ও দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম এলাকায় যখন কোন বিদ্যালয় ছিলনা, তখন তিনিই উদ্যোগী হয়ে আরও কয়েকজন সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালক্রমে তাঁর কাজের পরিধি প্রসারিত হয়, সমাজের বিভিন্ন অংশের সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবিদাওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এভাবেই বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি দার্জিলিং জেলায় পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন।

নিজে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের এক বিশিষ্ট সংগঠক ও নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করা ছাড়াও শিক্ষার বিভিন্ন দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। পাহাড়ে নেপালিভাষী জনগণের আন্দোলনকে সঠিক লাইনে গড়ে তোলার জন্য তিনি পার্টির শিক্ষার ভিত্তিতে আদর্শগত প্রচারের কার্যক্রম নেন এবং পাহাড়ে সাংগঠনিক ভিত্তি স্থাপনেও সমর্থ হন। যার ফলে, গত লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং কেন্দ্রে পার্টি স্থানীয় গোর্খা জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করতে সক্ষম হয়।

চা-বাগান শ্রমিকদের চরম শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বিশিষ্ট যুব ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক কমরেড তন্ময় মুখার্জীর হত্যাকাণ্ডে যুক্ত

চা-বাগান মালিক, জমির দালাল চক্র ও কায়েমী স্বার্থের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই পরিচালনা করে অনিচ্ছুক প্রশাসনকে দিয়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করানোর জন্য তাঁর নিরলস চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল। নানা ধরনের জনসেবামূলক কাজ ও ক্লাব সংগঠন গড়ার মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ির সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন। গণআন্দোলনে বহুবার তিনি পুলিশি নির্যাতনসহ কারাবরণ ভোগ করেছেন। তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য তিনি শুধু পার্টির কর্মী-সমর্থকদেরই নয়, সাধারণ মানুষেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পাড়ার মানুষজন, পার্টির কর্মী-সমর্থকদের অসুস্থতায়, আপদে-বিপদে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী উন্নত রুচি-সংস্কৃতি অর্জন করার জন্য তিনি সর্বদা সংগ্রাম করেছেন। যাঁরাই তাঁর কাছাকাছি আসতেন, সকলকেই তিনি পার্টির সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর সংস্পর্শেই তাঁর পরিবারের সকলে পার্টির সমর্থকে পরিণত হন। পার্টির কাজে যাতে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতে পারেন, সেজন্য তিনি স্বেচ্ছাবসরের আবেদন করেছিলেন যা মঞ্জুর হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু তার আগেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে গেল।

১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কমরেড স্বপন মল্লিকের মরদেহ এস ইউ সি আই দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ে শায়িত ছিল। এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুনীল মুখার্জী কমরেড স্বপন মল্লিকের মরদেহে মাল্যার্পণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বহু বিশিষ্ট মানুষ ঐ সময় প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সি পি আই (এম এল এন ডি)-র শ্রীধর মুখার্জী, সি পি আই-এর পীযূষ গুহ, জাতীয় কংগ্রেসের পীযূষ বোস, সি পি আই (এম)-এর পক্ষে পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, আর এস পি-র বিকাশ সেন রায়, সি পি আই (এম এল লিবারেশন)-এর বাসুদেব বোস এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী টিকেন্দ্রজিৎ মুখার্জী ও বিশিষ্ট নাট্যকার মলয় ঘোষ।

দলের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক যথাক্রমে কমরেড শিশির সরকার ও কমরেড তপন ভৌমিক এবং দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য প্রয়াত কমরেড মল্লিকের মরদেহে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন।

কমরেড স্বপন মল্লিকের স্মরণসভা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে।

কমরেড স্বপন মল্লিক লাল সেলাম !

নেপালের জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে

পাঁচের পাতার পর

সংগ্রাম বলে মনে করি।

তিনি বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাতে পেরেছিল রুশ বিপ্লব। চীনের বিপ্লবে সেদেশের বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে পাশে পেয়েছিলেন। ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাহায্য পেয়েছিলেন। আজ রাশিয়ায় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীনেও পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন ঘটেছে। নেপালের জনগণের পাশে আজ সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই। এই অবস্থায় নেপালের জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির লড়াই অনেক কঠিন ও কঠোর। তাই তাঁদের এই লড়াইকে আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি, অভিনন্দন জানাই।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই দেখিয়েছিলেন, ভারতীয় পুঁজিবাদ কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষত শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করছে। ভারতের এই সম্প্রসারণবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকেও লড়তে হবে। নেপালের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আমেরিকা, ভারত ও চীন নেপালকে যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করতে চাইছে। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন ঘটলেও দেশে দেশে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, মেহনতি মানুষের লড়াই নতুন শক্তি নিয়ে আবার গড়ে উঠছে। পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে। নেপালের জনগণের আন্দোলনকেও এর সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। আমরা জানি, নেপালের জনগণের আন্দোলনের প্রতি ভারতের শোষিত জনগণের সমর্থন প্রয়োজন। এদেশের শোষিত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা সমস্ত দিক থেকে আপনাদের পাশে থাকব। গণতন্ত্রের দাবিতে নেপালের জনগণের আন্দোলন জয়যুক্ত হোক।

এই সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্য থেকে সহস্রাধিক নেপালীভাষী মানুষ যোগ দিয়েছিলেন।

ইউনেস্কো প্রতিবেদন

সর্বজনীন শিক্ষায় কিউবা শীর্ষস্থানে

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিউবার অবস্থান সবার উপরে। গত ৮ নভেম্বর'০৪ প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুর, বিশেষত সবচেয়ে দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে কিউবার পাশপাশি কানাডা, ফিনল্যান্ড ও কোরিয়াকেও এক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে, এদেশগুলো মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যদের কাছে আদর্শস্থানীয় বলে বিবেচনার যোগ্য।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের বিবেচনায় কিউবা একটা অনুন্নত দেশ। উপরন্তু, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশটির ওপর গত ৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে অন্যায়ভাবে অবরোধ চাপিয়ে রেখেছে। এর ফলে বাইরের একফোঁটা সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, কারও সাথে স্বাভাবিক ব্যবসাবাণিজ্য করাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে কানাডা বিশ্বের সবচেয়ে শিল্পোন্নত জি-৭ ভুক্ত দেশ। ফিনল্যান্ড ও কোরিয়াও শীর্ষস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আয়তনে কিউবা অনেক ছোট দেশ। জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ১২ লক্ষ। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপানের মত দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী দেশকে পেছনে ফেলে শিক্ষাক্ষেত্রে কিউবার এই অগ্রগতি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

ইউনেস্কোর উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে কিউবা তার জাতীয় আয়ের ১০ থেকে ১১ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। দুনিয়ার আর কোন দেশ শিক্ষায় এত ব্যয় করে না। ফিনল্যান্ডতার জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করে। উল্লেখ্য, কিউবা একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ। ১৯৫৯ সালে বিপ্লবের পর সেখানে জনগণের অন্য মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের পাশাপাশি শিক্ষার ওপরও খুব জোর দেওয়া হয়। এর ফলে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে দেশটির ৯৬.৯ ভাগ মানুষ সাক্ষর হয়ে ওঠেন। কিউবার ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতও খুব ঈর্ষনীয়, প্রাথমিকে ১ঃ ১৩.৫ এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে ১ ঃ ১৫। কিউবার শিক্ষাব্যবস্থায় সবার জন্য নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তর সবার জন্য উন্মুক্ত ও অবৈতনিক।

উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিউবার শিক্ষা ব্যবস্থা (ভৌত শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন ও ললিতকলা শিক্ষাসহ) সর্বদিক দিয়ে ব্যক্তির মানোন্নয়ন ঘটায়, অন্যদিকে শিক্ষাকে খুব পরিষ্কারভাবে জীবন, কর্ম ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত রাখে।'' প্রতিবেদনটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হল ''কিউবার ছাত্ররা ভাষা এবং গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে, একটা স্তর শেষ করতে তারা সময়ও নেয় কম। এ চিত্র কিউবার সব স্কুলে দেখা যায়। দেশটিতে লিঙ্গ ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্যের মাত্রাও ব্যাপকভাবে কমে গেছে।''

(ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, নিউইয়র্ক, ২৩ ডিসেম্বর '০৪)

রেলে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে দেওয়া হলো

রেলওয়ে বোর্ডের এক অর্ডারে (No. E(NG)-11/94/RR-1/29 dated 26.7.04, RBE No. 166/2004) রেলওয়েতে নিয়োগের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা তিন বছর করে কমিয়ে দেওয়া হল, অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর পদের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৪-৮-০৪ তারিখ থেকে তিরিশ বছর থেকে কমিয়ে করা হল ২৭ বছর। চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের জন্য তেত্রিশ থেকে কমিয়ে ত্রিশ করে দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, যেখানে গত কয়েক বছর ধরে বেশিরভাগ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নিয়োগই আইন করে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, সেখানে এই সিদ্ধান্ত তো কয়েক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীকে শুধুমাত্র বয়সের কারণেই চাকরির ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করে দেওয়া হল। অর্থাৎ, বাস্তবে সরকার বেকার যুবকদের চাকরি দেওয়ার দায়িত্বকেই পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net